প্রেম ও যৌনসম্পর্ক
মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

প্রেম-ভালবাসা সহ জীবনের ব্যক্তিগত সমস্ত কিছুকে জড়িয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের ভিত্তিতে জীবন সংগ্রাম পরিচালনা করে তবেই একজন ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃত কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। জীবনে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা এবং যৌনতার শক্তি বিরাট। এর সাথে যখন সঠিক আদর্শ যুক্ত হয়, সেটা তখন প্রবলতর শক্তিতে, উন্নত সংস্কৃতিতে, রুচিতে, সৌন্দর্যে আর সমাজ প্রগতির যথার্থ প্রয়োজনে ব্যক্তিকে শক্তিমান করে তোলে।

নরনারীর সম্পর্ককে ভিত্তি করে ভালবাসা ও যৌনতার যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কিছু আলোচনা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, এই সমস্যার কিছু কিছু লক্ষণ দলে দেখা যাচ্ছে, যাকে ইংরেজিতে 'সিম্পটম' বলা হয়—অবশ্যই তার বেশি কিছু নয়। তাই তিনি চাইছেন, এই অবস্থাতেই, অর্থাৎ শুরুতেই, কমরেডদের সামনে এ সম্পর্কে একটা গাইডলাইন থাকা দরকার, যাতে সমস্যা আর বাড়তে না পারে। যে লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলো খুবই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে বলে তাঁর ধারণা। তবে একথাও তিনি বলেছেন যে, লক্ষণগুলো, বিপ্লবী কর্মীদের আচরণ যেরকম হওয়া দরকার, সেই স্ট্যান্ডার্ডের মতো নয়। সুতরাং এ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার জন্যই তিনি এই আলোচনা চাইছেন।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার, ধর্মীয় কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের কল্যাণের ভিত্তিতে আদর্শগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বিপ্লবকে কেন্দ্র করে বুর্জোয়া মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে দীর্ঘদিন ধর্মীয় প্রভাবাধীন সমাজে নারীদের হেয় করে, গ্লানি দিয়ে, সেক্স এবং নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্ককে

অন্যভাবে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তার থেকে তাকে মুক্ত করে মানুষকে একটা সঠিক রাস্তা দেখাবার চেষ্টা করা হল। বলা হল যে, এ প্রাকৃতিক শক্তি, পুরাণে যে প্রাকৃতিক শক্তির শিকার স্বয়ং দেবতারাও। হিন্দু ধর্মের পুরাণ বা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের পুরাণ পড়ুন, দেখবেন, সমস্ত দেবতা এবং ঋষিরাও এই প্রাকৃতিক শক্তির হাত থেকে মুক্ত নয়। প্রকৃতির নিয়মকে গায়ের জোরে অস্বীকার করা যায় না। দেখা গেছে, এই জিনিস যারা অস্বীকার করেছেন, প্রকৃতি কী ভাবে তাদের উপরে প্রতিশোধ নিয়েছে। তাহলে এটা একটা প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া। প্রকৃতির নিয়মে নরনারীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর পরস্পরকে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করে। সামাজিক ঐক্য রক্ষা করার জন্য ধর্ম দীর্ঘকাল তাকে একটা সামাজিক ন্যায়নীতিতে বাঁধবার চেষ্টা করেছে। বেঁধেছে কিছুদূর পর্যন্ত একথা ঠিক, কিন্তু খানিক দূর যাওয়ার পরেই দেখা গেল, উপরে বাঁধন থাকা সত্ত্বেও অনেকের ক্ষেত্রেই ভিতরে ভিতরে সেক্সের চোরাস্রোত ঘরের অন্দরমহলে পর্যন্ত ঢুকে গেছে। কারণ, এ অন্য জিনিস। মানুষ যেমন আর্থিক শোষণ থেকে মুক্তি চাইছে, সংস্কৃতিগত নানা শোষণ থেকে মুক্তি চাইছে, রাজনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি চাইছে, চিন্তাগত নানা কঠোর নিয়ন্ত্রণ (regimentation) থেকে মুক্তি চাইছে, তেমনি সেক্সের দাসত্ব থেকেও মুক্তি চাইছে। যখন থেকে মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, মুক্তির জন্য লড়ছে, সে কি শুধু সামাজিক অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তির কথা বলেছে! এই মুক্তির কথার মধ্যে রয়েছে সেক্স সংক্রান্ত যত বাধানিষেধ ও বাধ্যবাধকতা আছে, তার থেকেও মানুষকে মুক্তি দেওয়া। সেক্স-এর স্বাধীনতা, অর্থাৎ ভালবাসার স্বাধীনতার জন্য, যৌন দাসত্বের হাত থেকে মুক্তির জন্য মানুষ লড়ছে অতীত কাল থেকে। সমাজ প্রগতির এক একটা স্তরে সেক্সকে এক একভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

আমাদের দেশে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বা সমাজ জীবনে ভালবাসা ও যৌনতার সমস্যা বর্তমানে যেরকম দেখা যাচ্ছে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত সেই আকারে দেখা দেয়নি। সমস্যাটা ছিল না তা নয়, কিন্তু আজকের মতো এত তীব্র এবং জটিল আকার নিয়ে দেখা দেয়নি। সেদিনও এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে অনেকে ব্যক্তিগত জীবনে নানাভাবে ভুগেছেন। তাতে অনেকেরই অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সেটা গোটা সমাজের একটা সংকটজনক ফেনোমেনা বা ঘটনা হিসাবে দেখা দেয়নি। আজকের সমাজে এই বিষয়টা আমরা যেরকম দেখছি, সেইরকম ব্যাপক আকারে তা প্রভাব বিস্তার করেনি। তার মানে এটা নয় যে, সমস্যাটা তখন ছিল না। আমি সেকথা বলতে চাইছি না। তাছাড়া সেটা বাস্তবও নয়। আসলে পুরনো সমাজে সেদিনকার ধারণা অনুযায়ী নীতি-নৈতিকতার একটা

বাঁধন ছিল। যৌথ পরিবারের একটা অনুশাসনও সেদিন সমাজে কাজ করেছে। তাতে যুবক-যুবতীদের জীবনেও নীতি-নৈতিকতার এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ কাজ করেছে। পারিবারিক জীবনেও নীতি ও নৈতিকতার একটা বাঁধন কাজ করতো। আজকের সমাজে সেই অনুশাসন আর আগের মতো কাজ করে না। যেখানে যতটুকু তা অবশিষ্ট আছে, সেটাও আজ ভাঙার মুখে। আমাদের বুঝতে হবে যে, যৌবনের অভ্যুদয়ের মুখে শরীরধর্মকে কেন্দ্র করে যে তীব্র তাড়না দেখা দেয়, সেটা সেক্সকে কেন্দ্র করেই দেখা দেয়। এটা একটা বাস্তব সত্য। এটা আগে বাঁধা থাকতো নীতির অনুশাসনে। সমাজ পরিবেশ তাকে খানিকটা স্তিমিত করে রেখেছিল। ফলে তলে তলে অনেক ব্যতিক্রম ঘটলেও তার কুৎসিত রূপটা বাইরে সেভাবে প্রকাশ পায়নি। যখন যৌনতার চাপকে অস্বীকার করতে না পেরে লুকিয়ে কেউ কিছু করে ফেলেছে, তখনও এই কাজটা যে অন্যায়, এই ধারণা থেকে মনের ভেতরে বিবেকের দংশনে সে ভুগেছে। নীতির অনুশাসন তার ভিতরে কাজ করেছে। সেই অনুশোচনার জন্য সে নিজের ভুল শোধরাবার চেষ্টা করেছে, তার সেই গ্লানি থেকে সে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছে। সেদিনকার সমাজ পরিবেশটা এইরকম ছিল। আজকের সমাজ পরিবেশে এই নীতির অনুশাসন অনেকটা আলগা হয়ে গেছে। ফলে সেই যৌনতাড়না প্রচণ্ড বেগে চেপে বসেছে ছেলেমেয়েদের মধ্যে, অথচ তার মধ্যে ন্যায়-নীতির বাঁধন আগে যতটুকু ছিল, তাও নেই।

একথাও আপনারা জানেন যে, কিছুদিন আগেও মেয়েরা ঘর থেকে বের হতে পারতো না। সেই অর্থে মেয়েরা আজ কিছুটা স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতাকেও আপেক্ষিকভাবে বুঝতে হবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে মেয়েরা আজকাল লেখাপড়া করে, স্কুল-কলেজে যায়। ফলে নানা বাধ্যবাধকতার মধ্যেও এক ধরনের স্বাধীনতা তারা আজকাল ভোগ করছে। তারা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, রেস্টুরেন্টে চা খায়, মনমাফিক মাস্টারমশাইদের সঙ্গে কাব্য-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে। এইসব করতে করতেই তাদের মধ্যে এক দল ভালবাসায় জড়িয়ে যায়। আসলে এগুলো উপলক্ষ মাত্র। আপনাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষিত মানুষদের যৌনসম্পর্ক বন্য জন্তু-জানোয়ারদের মতো নয়। সেটাকে তারা ঘৃণা করে। তাই তাদের মেলামেশা, শিল্প- সাহিত্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা, গল্প-গুজব এসবের মধ্য দিয়েই পরস্পরের ভালবাসা গড়ে ওঠে। আবার দেখা যায়, ভালবাসার জন্য একদল উন্মুখ হয়ে থাকে। ফাঁক পেলেই তাক করে থাকে, কাকে ভালবাসবে। কেউ সুযোগ পেল তো ভালবেসে ফেলল। আবার কেউ যদি সুযোগ না পায়,

তাহলে তার আর ভালবাসা হল না। কারও সাহস কম, তাই সে বেশিদূর এগোতে পারল না। একটি মেয়ে মনে মনে যে ছেলেটিকে ভালবাসে, সেই প্রস্তাবও সেই ছেলেটির সামনে সে পেশ করতেই পারল না। তাকে কিছু বলতেই পারল না। এইসব নানা কারণে তার আর ভালবাসা হল না। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই। একথা সত্য যে, ছেলে এবং মেয়েরা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করবে।

আমি আগেই বলেছি, পুরনো নীতি-নৈতিকতার ধারণা আজ পাল্টে গেছে। আগে যেটা পুরনো অনুশাসনের ভিত্তিতে আবদ্ধ ছিল, আজ সেটা অনেকটা খোলা ময়দানে এসে গেছে। আজ বেশ কিছু ছেলেমেয়ে মনে করে, প্রেম করা জীবনের একমাত্র মোক্ষলাভ। তারা জানে না, প্রেম যখন দৈনন্দিন জীবনেরই অঙ্গ হয়ে পড়ে, তখন. প্রেমের সেই আগের রূপ আর থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা একসময় মনে করতো ভালবাসা না পেলে তাদের জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে, কিন্তু যখন ভালবাসাটা তাদের কাছে রোজের ব্যাপার হয়ে যায়, তখন তারা আর এক জায়গায় নতুন ভালবাসার সন্ধান করে। আগেকার সেই ভালবাসা ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। যারা আবার দুর্নামের জন্য, অর্থাৎ লোকে কী বলবে—এটা ভেবে নতুন ভালবাসা করতে যায় না, দেখা যায়, তারা সবসময় খিটখিট করে। নিজের স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে একটু হেসে মেলামেশা করতে দেখলে বা চলতে ফিরতে দেখলে সন্দেহ করে, নানারকম প্রশ্ন করে, তাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আবার কোনও মেয়ে তার স্বামীকে যদি আরেকটি মেয়ের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে দেখে বা চলাফেরা করতে দেখে, তাহলেই তার মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ সে জানে যে, তারা দু'জনেই ভালবেসে বিয়ে করেছে। যদি সত্যিই তারা একে অপরকে ভালবেসে বিয়ে করে থাকে, তাহলে স্বামী কার সাথে মিশছে তা নিয়ে সবসময় সে তটস্থ হয়ে থাকে কেন? কেন স্বামী অপরের সাথে মিশলে ভুল বোঝাবুঝি হয়—স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যে গভীর প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ, অর্থাৎ যে যৌনসম্পর্কে আবদ্ধ, সেই সম্পর্কে কেন চিড় ধরে। তবুও কোনও একটা সময় হতে পারে, একজন মেয়ে কমরেডের সাথে একজন বিবাহিত পুরুষ কমরেডের মেলামেশা করতে ইচ্ছা করছে। স্ত্রী এ ব্যাপারে সন্দেহ করলে বলছে, এটা তো নিছক ভাই-বোনের সম্পর্ক। স্ত্রী তখন বলতে শুরু করে, সে তার ভাই-বোনের সম্পর্ক কী সেটা জানে না? তার সাথেও তো সে ভাই-বোনের সম্পর্ক দিয়েই শুরু করেছিল। তার এই দাদা-বোনের সম্পর্ক কী, সেটা কি সে ভুলে গেছে? ফলে তার মন খচখচ করে। এভাবে হাজার একটা অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

আরেকটি বিষয় বলছি। আজকাল সাধারণ ঘরের একদল বাবা-মাও ছেলেমেয়েদের নিজেদের পাত্র বা পাত্রী পছন্দ করে নিতে সাহায্য করে। কেউ বাড়িতে এলে মা বলে, 'খুকি ওকে চা দিয়ে আয়। তোরা গল্প কর, আমার কাজ আছে, আমি আসি'। কখনও বলে যে, 'বদ্ধ ঘরে বসে থেকে কী হবে, যা তোরা দু'জনে একটু বেড়িয়ে আয়'। এর অর্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না। একথার অর্থ হল, 'তোরা একটু প্রেম করে আয়'। আজকালকার একদল বাবা- মা এইভাবে মেয়েদের সাহায্য করেন ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, এইভাবে যাতে তারা জীবনের সঙ্গী বেছে নিতে পারে, সে ব্যাপারে সাহায্য করেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, যে ছেলে ভাল টাকা উপার্জন করে তার সাথেই এভাবে মেয়ের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পর দেখা যায়, ছেলেটা নাইট ক্লাবে গিয়ে ফূর্তি করে, আরেকটি মেয়ের সাথে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বাইরের লোকের কাছে ওরা স্বামী-স্ত্রী বলে বেড়ায় যে, ওরা খুব সুখে আছে। আসলে ভেতরের পরিস্থিতিটা হল যে, চব্বিশ ঘন্টা তারা দাঁত কিড়মিড় করে, প্রায় সর্বক্ষণই তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি চলে। আর বাইরের লোককে বোঝায় যে, তারা খুব সুখে আছে। বলে, আমাদের মতো সুখে আর কেউ নেই। এইভাবেই তারা সারা জীবন মিথ্যাচার করে নিজেদের জীবনকে নষ্ট করে। কেন না ভালবাসা কী, তা তারা বুঝেই উঠতে পারেনি এবং সত্যিকারের ভালবাসাও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভালবাসাটা কী? শিশুর ভালবাসা নিয়ে মানুষ মাথা ঘামায় না। বৃদ্ধের স্নেহ-ভালবাসা নিয়েও মানুষ মাথা ঘামায় না, যদি না তার কিছু বদ অভ্যাস থাকে। এগুলো নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাহলে যুবক-যুবতীর ভালবাসা নিয়ে মাথা ঘামায় কেন? আসল কথাটা হচ্ছে, সেখানে আছে পরস্পরের প্রতি যৌন আকর্ষণ। সেটা সরাসরি যৌন আকর্ষণের রূপেই শুরু হোক, আর কবিতার লাইন দিয়ে বা গানের গুন গুন করার মধ্য দিয়ে শুরু হোক, বা চিঠি লেখালেখি দিয়ে শুরু হোক, অথবা এক জন আর একজনের সঙ্গে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে তা দিয়ে শুরু হোক, এটা আসলে যৌন আকর্ষণ। রুচি-সংস্কৃতির গঠনের আলাদা আলাদা প্রকৃতির জন্য বা ঘটনা সমাবেশের বৈচিত্র্যের জন্য কারওর মধ্যে সেক্স স্বাভাবিকভাবে আসে আবার কারওর মধ্যে কাব্য, আলোচনা, তর্কাতর্কি, সিনেমা দেখা, খালি ঘোরা, খালি রেস্টুরেন্টে যাওয়া, খালি চিঠিপত্র লেখা, এগুলোর মধ্য দিয়ে আসে। আসল কথাটা হচ্ছে, একটা যৌন আকর্ষণের রূপ হিসাবে এই ভাললাগা, ভালবাসাটা যুবক-যুবতীদের মধ্যে আসে। এটা প্রকৃতির নিয়ম। ফলে ভালবাসার সমস্যা শুরু হয় যৌবনের অভ্যুদয় থেকে, আর

শেষ হয় প্রৌঢ়ত্বে গিয়ে। অবিশ্যি যারা বিকৃত রুচিসম্পন্ন (pervert) তারা প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছাবার পরেও এর থেকে মুক্তি পায় না। এরা জীবনে আনন্দ পায়নি, সেক্স নিয়ে এরা নানারকম মিথ্যাচার করে ও অপরকেও ঠকায়।

যৌনতা একটা বাস্তব সত্য। একথা মানতেই হবে যে, শরীরধর্মের দিক থেকে, মানসিক সুস্থতার দিক থেকে, সাধারণ মানুষের যৌনজীবনের একটা প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিপদটা ঘটে এই সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনার তাড়নায় যেসব ছেলে-মেয়ে কল্পনার জাল বোনে বা কাব্য বা কবিতা রচনা করে তাদের নিয়ে। আসলে তারা কী চায়? কেউ কেউ বলে যে, সে আর কিছু চায় না, শুধু ভালবাসতে চায়। যাকে সে ভালবাসে, তার কাছ থেকে সে এর বেশি কিছু আশা করে না। তাকে সে চিরকাল ভালবেসে যাবে, এতে ক্ষতি কী? সে তার কথা ভাববে, পার্টির কোনও ক্ষতি করবে না। একথা মুখে বললেও দেখা যায়, তার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। সে আর মনে কোনও আনন্দ পাচ্ছে না। কোনও কাজে সে উৎসাহ পায় না, এমনকী রাতে তার ঘুম হয় না। কিন্তু কেন? এরকম অস্বস্তিতে সে ভোগে কেন? সে আর কিছু চায় না, চিরকাল ভালবেসে যাবে, এটাই যদি যথার্থ সত্য হয়, তাহলে তার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? এটা তো বিনা কারণে ঘটতে পারে না। যথার্থ ভালবাসা হলে তো এরকম হওয়ার কথা নয়। এরপরেও সে আর পাঁচ জনের কাছে বলতে শুরু করে দেয় যে, সে কারওর অনিষ্ট করতে চায় না। আর বলে বেড়ায়, অমুক কমরেড সম্পর্কে সে মনে মনে ভালবাসার আকর্ষণ বোধ করে। এইভাবে এটা একটা 'গসিপ', অর্থাৎ পাঁচ জনের আলোচনা বা গল্প-গুজবের বিষয় হয়। ফলে এতে ক্ষতি হয়। আসল কথাটা বোঝা দরকার। এই যে সে কাব্য করে বলে বেড়াচ্ছে যে, সে আর কিছু চায় না, ব্যাপারটা সত্যই কি তাই? যদি সে যাকে ভালবাসে, সে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করত, তাহলে কি সে তার কাছ থেকে সত্যি কিছু চাইত না? যেহেতু সে বুঝতে পারছে যে, যাকে সে চায় সে তাকে গ্রহণ করতে চাইছে না, তাই সে কাব্য করে বোঝাতে চাইছে, সে আর কিছু চায় না। আসলে সে এসব কথার আড়ালে যেটা চায়, সেটা হল তার সাথে স্বাভাবিক যৌনজীবন, বিবাহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে। সাধারণভাবে ভালবাসার মধ্যে একটা স্নেহ-মায়া-মমতার সম্পর্ক থাকে। সেটা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। সেটা তো স্বাভাবিক স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক। সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন মানুষ তাকে কেন্দ্র করে যৌনজীবন যাপন করতে চায়। মানুষ তো আর জন্তু-জানোয়ার নয়। মানুষ সভ্যতার স্রষ্টা। মানুষ তাই জন্তু-জানোয়ারের মতো আচার-আচরণ করতে পারে না। জন্তু-জানোয়ারদের এ ব্যাপারে কোনও বাছ-বিচার নেই— যাকে সামনে

পেল, তার সঙ্গেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করল। কিন্তু মানুষ সেটা পারে না। যারা সেরকম আচরণ করে, তারা নিচু চরিত্রের মানুষ। একটু সুযোগ পেল তো সেটা সে ভোগ করল এবং সেটা সে করে কোনও ভালবাসার সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়। এ ধরনের কাজ খুব নিচু জাতের, বিকৃত মনের পরিচায়ক। মনে রাখতে হবে, আমরা আদিম মানুষ নই। আগেই বলেছি যে, আদিম মানুষ যেখানেই পারত, সেখানেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করত। সেদিনের অর্থে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আজ সভ্য মানুষের জীবন সেই অর্থে জটিল হয়েছে। সভ্য মানুষের যৌনজীবনের সাথে মিশেছে তার রুচি এবং সংস্কৃতি। সেটা নগ্ন যৌনতা নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যৌনতা সম্পর্কে একজনের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক কি না, তা কী দিয়ে নির্ধারিত হবে? প্রকৃতির এই যে শক্তি একজনের মধ্যে কাজ করছে, তা তার চরিত্রের বিকাশ সাধন করতে, মানুষ হিসাবে তাকে বড় করতে, অরুচিকর নানা জিনিস থেকে তাকে মুক্ত করতে, তার জীবনকে আরও উন্নত করতে এবং সমাজকে বিকশিত করার সংগ্রামের পরিপূরক হিসাবে তার জীবনে তা এল কি না, সেটা দিয়ে তা বিচার করতে হবে। যৌনতা বা নরনারীর একে অপরের প্রতি যৌন আকর্ষণ কারওর মধ্যে এসে তাকে নিম্নগামী করে দিল, কী তাকে মহৎ মানুষ করে দিল, এই প্রকৃতি দিয়ে তার বিচার হবে। যে জিনিস এসে একজনকে বড় মানুষ করে দেয়, তাকে আরও বড় বিপ্লবী করে দেয়, ভালবাসতে গিয়ে সে কারও কাছে বাঁধা পড়ে না, ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী ভালবাসার জোরে তাকে দিয়ে কোনও হীন কাজ করাতে পারে না, বরঞ্চ সে কোনও হীন অনুরোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি তার ভালবাসা শুকিয়ে যায়, শেষপর্যন্ত তার প্রতি যৌন আকর্ষণও শুকিয়ে যায়। ভালবাসা যদি এইভাবে আসে, সেক্সের আকর্ষণ যদি তেমন প্রকৃতি নিয়ে আসে, তাহলে সে মঙ্গলময়, তাকে আহ্বান কর। অর্থাৎ, এইভাবে সেক্স আসার ফলে একজন বিপ্লবী আগে যা ছিল, তার চেয়ে সে বড় বিপ্লবী হয়েছে, তার স্বার্থত্যাগ করার ক্ষমতা আরও বেড়েছে, যৌন দাসত্ব থেকে সে আরও বেশি মুক্ত হয়েছে। ভালবাসার মানুষ তাকে এতটুকু দুর্বল করতে পারেনি, বরং তার গুণ আরও বেড়েছে। অপরদিকে যাকে ভালবেসেছে, তাকেও সে আরও উন্নত করেছে।

আর একজন বড় বিপ্লবী ছিল। বিপ্লবের চিন্তা ছাড়া তার মাথাতে কিছু ঢুকত না। বিপ্লবের কাজে সে সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বিপ্লবের জন্য সে বাড়ি ছেড়েছে, সর্বস্ব ছেড়েছে, জেল খেটেছে, যথেষ্ট জ্ঞান-বিদ্যা অর্জন করেছে এবং অন্যদের শ্রদ্ধা-ভক্তিও অর্জন করেছে। ত্যাগ করার ক্ষমতাও তার ভাল রকমের ছিল। তাকে যে ছেলেটি বা মেয়েটি ভালবেসেছে, সেই ছেলেটি বা

মেয়েটিও সেরকম ভাবেই গড়ে উঠেছে। তারও এতগুলো ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে ভালবাসা আসার পর দেখা গেল, দু'জনের মধ্যেই এই ক্ষমতাগুলোর ঘাটতি হচ্ছে। তাহলে তাদের পরস্পর এই ভালবাসার চরিত্র কী? বিপ্লবীকে মহৎ হতে এখানে যৌনতা ও ভালবাসা সাহায্য করছে না, বরং ক্ষতি করছে। ফলে তাদের মধ্যে এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও তাদের ভালবাসার প্রকৃতি এবং যৌন আকর্ষণের প্রকৃতি পুরনো সমাজের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত, ব্যক্তিস্বার্থবোধের দ্বারা প্রভাবিত, ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতার (private property mental complex) দ্বারা প্রভাবিত। আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী সমস্ত সমস্যাকেই বিচার করি। আমরা একথা মনে করি না যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা করার একটা দর্শন মাত্র। এটা এমন একটা দর্শন, যেটা বিশ্ব প্রকৃতির বা মানব সমাজের সমস্ত ঘটনাবলির উপর আলোকপাত করতে পারে, সমস্ত সমস্যা নিরসনের সঠিক রাস্তা দেখাতে পারে।

আমাদের বুঝতে হবে যে, যৌনজীবন অসুন্দর নয়। মানুষের যৌনতার মধ্যে, যৌনপ্রবৃত্তি প্রকাশের মধ্যে অসুন্দর কিছু নেই। এটা খুবই স্বাভাবিক, ছেলে-মেয়েরা পরস্পরকে ভালবাসবে, তাতে অসুন্দরের কী আছে? এতে কুৎসিতেরও বা কী আছে? কুৎসিত হয় তখন, যখন এই সম্পর্ক বিবেককে আচ্ছন্ন করে, বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সত্যের উপর কখনও মিথ্যা কল্পনার আমেজ লাগাতে নেই। যেটা পাওয়ার নয়, সেটা মিথ্যা কল্পনা করে মন খারাপ করার দরকার কী? এতে মন অসুস্থ হয়। এসব না বুঝলে, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আপনারা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, নিজেদের কর্মশক্তিকে নষ্ট করবেন, মনের আনন্দ এতে নষ্ট হয়ে যাবে, আপনারা হতাশায় ভুগবেন। অথচ আপনাদের মধ্যে বিপ্লবী হিসাবে গড়ে ওঠার একটা ভাল সম্ভাবনা আছে। আপনারা সব ভাল ছেলে-মেয়ে। তাহলে আপনারা ব্যর্থ প্রেমিকে রূপান্তরিত হবেন কেন? আপনারা কি তাই চান? যদি না চান, তাহলে বুঝতে হবে, যে যৌন সম্পর্ক আপনারা চান, সেই সম্পর্কের মধ্যে রুচির প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা জন্তু-জানোয়ারের জীবন নয়। প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ রুচির একটা প্যাটার্ন থাকে, তার আবেগের রূপও সেরকম হয়। নরনারীর পরস্পর ভালবাসার আকর্ষণের মধ্যে ভদ্র ও রুচিসম্মত ভালবাসাই আমাদের কাম্য। আমাদের পারস্পরিক বিবাহিত বা যৌনসম্পর্কের রুচিগত মানটা এমন হওয়া দরকার, যাতে আশেপাশের কমরেডরাও এই সুন্দর সম্পর্ককে তারিফ করতে পারে। বিবাহিত জীবনের আনন্দ বা সুখ যদি শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই

সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সেই সুন্দর সম্পর্কও বেশি দিন সুন্দর থাকতে পারে না। এখানে উন্নত রুচির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ণায়ক। এইভাবে চলতে না পারলে মানুষ হিসাবে একজন নিজেকে ছোট করতে বাধ্য।

এ সম্পর্কে আর একটি বিষয় পরিষ্কার বুঝতে হবে। সেটা হচ্ছে, আমাকে যে চায় না, আমি তাকে চাইতে পারি না। আমি একসময় একজনকে চেয়েছিলাম, কিন্তু যে মুহূর্তে জানতে পারলাম, সে আমাকে চায় না, তৎক্ষণাৎ আমি আর তাকে চাইব না। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই ভালবাসাকে বন্ধুত্বে পরিণত করব। এই কথাটা শুধু মুখে বললেই হবে না, সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। এ নিয়ে আমার কোনও হা- হুতাশ থাকবে না। যা আমি পাব না, তা নিয়ে আমি জবরদস্তি করব কেন? তাহলে আমার সাথে একজন ইতরের, একটা 'লোফারের' পার্থক্য কী থাকবে? তাই আমি যেকোনও রকম আচরণ করতে পারি না। আমি একজনের সাথে যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলাম, সেটা তো ভালবাসার ভিত্তিতেই চেয়েছিলাম। তাছাড়া আমি যাকে ভালবেসেছিলাম, যার সাথে আমি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলাম, আমি আমার আচরণের দ্বারা এমন কিছু করতে পারি না, যার জন্য মেয়ে বা ছেলে হিসাবে তাকে সমাজের কাছে ছোট হতে হয়, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, কারও সামনে সে মুখ দেখাতে পারে না।

এটা তো স্বাভাবিক কথা যে, যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে আকর্ষণ করবে। আমি আগেই বলেছি, এটা শারীরিক ধর্ম। পরস্পর পরস্পরকে স্বাভাবিক নিয়মেই আকৃষ্ট করবে— যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয়, 'বায়োলজিক্যাল আর্জ', যেটা এখনও তার জৈবিক রূপের অর্থে স্বাধীন— যেটা আজও রুচির দ্বারা, বিবেকের দ্বারা পুরোপুরি বশীভূত হয়নি। সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়নি। বড়জোর দু'একজনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে হতে পারে, যাঁরা অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে সেইভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজ একদিন এমন জায়গায় আসবে, যেদিন গোটা সমাজে এ জিনিস হবে। সেটা হবে সেদিন, যেদিন সেক্সটা ব্যক্তিবাদী চাহিদা থেকে মুক্ত হবে, অর্থাৎ আমরা সেক্সের দাসত্ব থেকে মুক্ত হব। এ প্রসঙ্গে আমাদের একটা কথা বুঝতে হবে। আমরা শোষণের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে লড়ছি, সেই লড়াইয়ের তাৎপর্য আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, আমরা যেমন শোষণের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লড়ছি, তেমনি একইসাথে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সব কিছুকেই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শেকল থেকে মুক্ত করার জন্য লড়ছি। সমস্ত রকম দাসত্ব থেকে যেমন নিজেরা

মুক্ত হওয়ার জন্য লড়ছি, ঠিক একইভাবে যৌনদাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যও লড়ছি। সঠিক পথে সমস্ত রকম স্বাধীনতা অর্জন করার লড়াইয়ের মধ্যে, মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য লড়াইয়ের মধ্যে সেক্সের স্বাধীনতার লড়াইটাও, অর্থাৎ তার মধ্যে যৌনদাসত্ব থেকে স্বাধীনতা অর্জন করার লড়াইটাও নিহিত।

আমাদের মনে রাখা দরকার, যৌনদাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরিস্থিতি সমাজে সেদিন সৃষ্টি হবে, যেদিন সমাজের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অর্জিত হয়েছে। তার আগে নয়। বড় বিপ্লবী যে হতে চায়, তার কাছে ব্যক্তিসম্পত্তি পরিত্যাগ করাটা এমন একটা কিছু নয়। অতি সহজেই এটা সে করতে পারে, সৎ 'গান্ধাইট'রাও এটা করতে পেরেছে। কিন্তু ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা (private property mental complex) হচ্ছে একটা উপরিকাঠামোজনিত বিষয়, যা চিন্তার পদ্ধতির সঙ্গে, চিন্তা প্রক্রিয়ার সঙ্গে, রুচির গঠনের সঙ্গে জড়িত। সংস্কৃতিগত কাঠামো, সেক্সের ধরন-ধারণ, ইম্পালসের ধরন-ধারণ, যেগুলোকে আমরা বলি সুপারস্ট্রাকচার বা উপরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো সহজে পুরোপুরি পাল্টায় না। ধরুন, বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর অর্থনীতির দিক থেকে শ্রেণিহীন সমাজের পটভূমি তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত মালিকানা, ক্ষুদ্র শিল্প, এগুলোর বদলে সম্পূর্ণ সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর নেই, অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তির ভিত্তি আর কোথাও নেই। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিসম্পত্তিজাত যে মানসিক গঠন, মনের গঠন, সংস্কৃতির যে গঠন, ব্যক্তিসম্পত্তি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি মানুষের রুচি-সংস্কৃতি আগেকার সেই গঠন থেকে, তার সমস্ত জটিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে? আগেকার সমাজের মানসিক কাঠামোটি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে? না, সেটা একটা যুগ ধরেও পাল্টায় না। সমাজতন্ত্রের স্তরে জীবনের সর্ব দিক ব্যাপ্ত করে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমরা সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছাব, যেখানে অর্থনীতির দিক থেকে প্রত্যেকে 'নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী' থেকে প্রত্যেকে 'নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী' (from each according to his ability to each according to his need)— এই নীতিটি চালু হবে। মানুষকে যোগ্যতানুসারে যে মূল্য দেওয়া হয়, শ্রমের মূল্য বলে যে কথাটা, সেটাই উঠে যাবে—অর্থাৎ মূল্যতত্ত্ব উঠে যাবে, প্রত্যেকটি মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করছে, আর তার প্রয়োজন অনুযায়ী পাচ্ছে— এইরকম স্তরে সমাজ পৌঁছে যাবে।

যেমন ধরুন, সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সাম্যবাদী সমাজের পর দাসপ্রভুদের সমাজ এল, তারপরে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এল। সামন্ততান্ত্রিক

সমাজের আর্থিক কাঠামোর উপরে যে মানসিক ধাঁচাটা ছিল, যাকে সামন্ততান্ত্রিক ধরন-ধারণ বলা হয়, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে জমি সংক্রান্ত মোহ, জমি নিয়ে পরস্পর লাঠালাঠি, পরিবারের উপর পরিবার কর্তার কর্তৃত্ব, স্ত্রীর উপরে স্বামীর কর্তৃত্বের ধারণা, স্ত্রীর স্বামীকে প্রভু বলে চিন্তা করবার ধারণা, শিক্ষিত হয়েও এবং সমানাধিকার তত্ত্ব জানা সত্ত্বেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অবনমিত ভাব এবং মনে মনে স্বামীর শ্রেষ্ঠত্বের একটা ধারণা, মানসিক গঠন হিসাবে এইসব জিনিসগুলো কোথা থেকে গড়ে উঠেছে? গড়ে উঠেছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধর্মকে ভিত্তি করে ধ্যানধারণা এবং সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির আধারের উপর। এই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির আধারের উপর যে মানসিক কাঠামো গড়ে উঠেছে, সেটা পুঁজিবাদী সমাজে এসেও, অর্থাৎ পুঁজিবাদী আর্থিক কাঠামো গড়ে ওঠার পরও, মানসিক কাঠামোর মধ্যে খাদ হয়ে মিশে আছে। এমনকী আজও ইউরোপ থেকে এইসব প্রশ্নে সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব কি পুরোপুরি চলে গেছে? সেখানে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা এইসব আহ্বান সত্ত্বেও, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির কথা বলা সত্ত্বেও, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে যে উপরিকাঠামো গড়ে উঠেছে তাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা সব কিছু ইউরোপে আছে, কিন্তু তারই সঙ্গে মিশে আছে ধর্মীয় কুসংস্কার, তারই সঙ্গে মিশে আছে নারীর উপরে স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারের মানসিকতা। এ নিয়ে কল্পনা এবং রসালো ভাবনা, স্বামীকে সেবা করার মধ্যেই স্ত্রীর আনন্দ, জীবনে আর কোনও আনন্দই নেই — এই যে মানসিক গঠনটা, এই মানসিক গঠনের প্রক্রিয়াটা আজও সেখানে রয়েছে এবং তাকে নিয়ে কল্পনা, কাব্য-সাহিত্যও রয়েছে। এর অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে, অতীতের রেশ মানসিক গঠনের মধ্যে, চিন্তাপ্রক্রিয়ার মধ্যে, রুচি-সংস্কৃতির কাঠামোর মধ্যে থেকে যায়।

একটা সাধারণ জিনিস ধরে নিন, যেটা ছেলেদের মধ্যেও রয়েছে, মেয়েদের মধ্যেও রয়েছে। যারা ভুক্তভোগী তারা বিষয়টা বুঝবেন, অন্যেরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নেবেন। সাধারণত কী হয়? যখন কেউ কাউকে ভালবাসে, বা স্বামী বা স্ত্রী, ধরুন তারা দু'জনেই দু'জনকে মনে করে একে অন্যের সম্পত্তি। অর্থাৎ দু'জনেই দু'জনের সম্পত্তি। অথচ দু'জনেই স্বতন্ত্র মানুষ, স্বাধীন বিকাশের পথে দু'জন দু'জনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও বাধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু দু'জনেই ভাবছে, উনি আমার, ইনি আমার। দু'জনের সম্পর্ক কী মধুর! না, একজন আর একজনের সম্পত্তি, এই তাদের সম্বন্ধ। তারা দু'জন দু'জনকে ভালবাসে, দু'জন দু'জনের প্রতি দায়িত্ববান। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসার জন্যই তারা এটা করে, শ্রদ্ধা-ভক্তির জন্যই করে, প্রেম ও প্রীতির জন্যই করে। কিন্তু তার সঙ্গে

একজন আর একজনের সম্পত্তি— এ মনোভাবের সম্পর্ক কী? এর কি কোনও সম্বন্ধ আছে? এই যে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, তা সত্ত্বেও একজন আর একজনকে তার নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করে এবং এই মনে করার জন্য, বাস্তবে যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিলেও একজনের মঙ্গলের জন্য, বিকাশের জন্য অপরজন তাকে ছাড়তে পারে না, এর মানে হচ্ছে, পরস্পর পরস্পরের সম্পত্তি, একজনের জন্য অপরকে ধরে রাখা দরকার— এই বোধটি আমাদের মধ্যে সবসময় কাজ করে।

নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ আমরা শিশু বয়সে উপলব্ধি করতে পারি না। দেহের বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে আমরা তা উপলব্ধি করি। মানুষ লক্ষ্যবস্তু না থাকলেও ভেবে নিজেকে উত্তেজিত করতে পারে, যৌনক্রিয়া করতে পারে, যদিও তা বিকৃত উপায়ে। আবার মানুষ লক্ষ্যবস্তু সামনে থাকলেও ভেবে উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারে। জন্তু কিন্তু ভেবে তার এই উত্তেজনাটা (motor action) সৃষ্টি করতে পারে না, যেহেতু তার চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। একটা বিশেষ ঋতুতে লক্ষ্যবস্তু সামনে থাকলে জন্তুর উত্তেজনা এসে যায়, মানুষের তা হয় না, অনেক সময় তাতে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণাও হয়। মানুষের ক্ষেত্রে ভাবের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ তার চিন্তা-রুচি-সংস্কৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। তাই মানুষের জীবনযাত্রা, রুচি-সংস্কৃতি পাল্টাবার সাথে সাথে তার যৌন রীতিগুলিরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, যদিও কেউ বলতে পারেন, তার মৌলিক রূপ, অর্থাৎ যৌন সহবাস একই আছে— জন্তুরও যা, মানুষেরও তাই। না, তারও কলাকৌশলের অনেক উন্নতি হয়েছে, তার সাথে কল্পনা মিশ্রিত হয়েছে, তা রসগ্রাহ্য হয়েছে। আগেকার সমাজে দেহ ছাড়া অন্য কিছু ভাববার বিশেষ কিছু ছিল না। নারী স্বাধীনতার কথা তারা ভাবেনি। তারা পুরুষের সমস্ত রকমের সুবিধার কথা ভেবেছে। ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যাভিচারিতা, গণিকাবৃত্তি, মন্দিরে দেবদাসী, পঞ্চাশ বা একশো বিবাহ, রক্ষিতা রাখার প্রথা প্রভৃতি নানারকমভাবে পুরুষের যৌন স্বাধীনতার রাস্তা ধর্মীয় সমাজে খোলা ছিল। কিন্তু নারীকে পুরো বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে। বিবাহিত পুরুষ ছাড়া নারী আর কোথাও কোনও জায়গায় যেতে পারবে না। কিন্তু পুরুষকে এ কথা বলা হয়নি। পুরুষ পরনারীর প্রতি আসক্ত হলে হয়ত নিন্দা করা হত তবুও দেবদাসী প্রথা, গণিকাবৃত্তি, এগুলোকে একরকম বৈধ করা হয়েছে। এগুলোকে রাখাই হয়েছে এইজন্য যে, পুরুষের সেক্সের যে আকাঙ্ক্ষা, তার একটা বেরোবার পথ থাকা দরকার। যেমন ক্ষুধা পেলে খেতে হয়, তেমনি দেহের এই ক্ষুধাকে মেটানোর একটা পথ থাকা দরকার। ধর্মীয় সমাজ এইরকম ব্যবস্থা

করেছে। এর ফল ভাল হয়নি। নারী পুরুষের কুক্ষিগত হয়েছে, পরাধীন হয়েছে, অন্যদিকে পুরুষ ক্লীব হয়েছে, অমানুষ হয়েছে। এটা তো রাস্তা নয়।

রাস্তাটা হচ্ছে, নারীকেও মুক্তি দাও, পুরুষকেও মুক্তি দাও। তার সাথে উচ্চ সংস্কৃতি, সামাজিক দায়িত্ববোধ, রুচি, আদর্শবাদ তাদের মধ্যে জাগাও। এই দুটোর ভিত্তিতে যদি নারী-পুরুষ স্বাধীনভাবে পরস্পর পরস্পরকে বেছে নিতে পারে, তাহলে ধর্মীয় সমাজে আগে একে কেন্দ্র করে যে অমানুষিক অত্যাচার মেয়েদের উপরে চলছিল, আর পুরুষদের ব্যাভিচার (hetaerism) চলছিল, নারীদের ওপর পুরুষদের লাগাতার যে নিপীড়ন চলছিল তা বন্ধ করা যেত। নানা পরিবারে ঘরের বিধবা বোনকে নিয়ে, ভাইয়ের বিধবা বৌকে নিয়ে কী কী হয়, তা আপনারা জানেন। বাইরে যারা বক্তৃতাবাজি করে, ঘরের পর্দার আড়াল খুলে দিলে তাদের অনেকেরই মুখে কালি লেপে দেওয়া যায়। মেয়েদের বেঁধে রাখার ফল হয়েছে এই। অসত্য, মিথ্যাচার, নষ্টামি, বদমায়েসি, নিম্নগামিতা এ সমস্ত বেড়েছে। মানুষ হীনবল হয়ে পড়েছে। চরিত্রহীনতা, লোভ প্রভৃতি সমস্ত সমাজকে পঙ্গু করে দিয়েছে। দাসত্ব, ক্লীবত্ব, জড়ত্ব এইগুলোর মধ্যে মেয়েদের আটকে রাখা হয়েছে। ফলে এর হাত থেকে তাদের মুক্তি দাও। এই কথা মানুষকে, সমাজকে যাঁরা ভালবেসেছেন তাঁরা সকলে বলেছেন। শরৎবাবু বললেন, নারীকে মুক্তি দাও, স্বাধীনতা দাও। নজরুলও বললেন তাই। তাঁরা বললেন, নারীকে স্বাধীনতা দিলে যদি ঝড়-বালি ওঠে, উঠুক। ঝড়-বালি উঠবে বলে কি নারীকে স্বাধীনতা দেবে না? স্বাধীনতা দাও, দিয়ে তাকে সচেতন করবার চেষ্টা কর যে, স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে নেই। স্বাধীনতা তাকে দিয়েছি বড় মানুষ হওয়ার জন্য। স্বাধীনতা দিয়েছি নারী দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের একজন মানুষ হবে, বড় হবে, উন্নত হবে, উন্নত নারী হবে। পুরুষরা নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছে এইজন্য যে, নারী এবং পুরুষ দু'জনের মিলিত জীবন যেন সুন্দর হয়ে গড়ে উঠে। নারী যদি অধঃপতিত হয়, ব্যভিচারিণী হয়, পুরুষ যদি ব্যভিচারী থাকে, তাহলে দু'জনের জীবন সুন্দর হতে পারে না। নারীকে মুক্তি দেওয়ার মানে হল, তাকে রুচি-সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাগানো, তার দায়িত্বশীলতাকে জাগানো, তাকে দায়িত্ববান করে তোলা— অপরের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি সে যাতে দায়িত্ববান হয়। যারা বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত, তারা নারীর মধ্যে জনসাধারণের প্রতি, বিপ্লবী দলের প্রতি দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ বাড়াবে। ন্যায় ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে, আদর্শের ভিত্তিতে, রুচির ভিত্তিতে নারী স্বাধীন হবে, আর আদর্শের প্রতি স্থির লক্ষ রেখে নিজেদের স্বাধীনতাকে তারা প্রয়োগ করবে।

ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা যাঁদের নেই, তাঁদের মধ্যে একদল বলে থাকেন যে, সেক্স সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি করা বা সেক্সকে পরিত্যাগ করার মধ্য দিয়েই মানুষ যৌনদাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। তাঁদের একথাটা ঠিক নয়। এমন অনেকে আছেন, যাঁদের বলা হয়, 'প্লেটোনিক' লাভার। অর্থাৎ, যাঁরা মনে করেন, ভালবাসার মধ্যে দেহের কোনও ভূমিকা নেই। তাঁরা সেক্সকে ঘৃণা করেন। মনে করেন, এই সেক্সটাই যত অনিষ্টের মূল। একটা জিনিস আপনারা লক্ষ করবেন যে, সাধারণত যখন কারওর চরিত্র নিয়ে কথা বলা হয়, তখন চরিত্র বলতে ওই সেক্সকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে— যদিও ইংরেজিতে 'ক্যারেকটার' কথাটার অর্থ বহুব্যাপক। কোনও মানুষ তার ভাইকে বা বাবা-মাকে সর্বস্বান্ত করছে বা তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করছে, তখন কিন্তু আমরা বলি না যে, সেই লোকটির চরিত্র খারাপ। সেই ব্যক্তি যদি তার সংসারের দায়িত্ব পালন না করে, সেটাকেও আমরা ততটা খারাপ চোখে দেখি না। চরিত্র বলতে আমরা সাধারণত সেক্সকেই বোঝাই। কোনও ব্যক্তি লোক হিসেবে যত খারাপই হোন না কেন, খারাপ কাজ করার পরেও যদি তিনি মেয়েদের মুখের দিকে না তাকান, সবসময় মেয়েদের পায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন, তাহলেই লোকে বলবে, তিনি খুব চরিত্রবান লোক। এই হল আমাদের দেশে লোকের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা। আমি বলি, চরিত্র কথাটার মানে এরকম নয়। বুর্জোয়া মানবতাবাদের সময় এই বিষয়টা একেবারে খোলাখুলি এসে গেল। ইউরোপে মানবতাবাদীরা যে ধারণা নিয়ে এলেন, তা হচ্ছে, মানুষের চরিত্র কি শুধু এই একটা জায়গায় আছে? তাঁরা বললেন, সেক্স নিয়ে এত মাথা ঘামাবার দরকার কী? চরিত্রের আর পাঁচটা দিক দেখ। ঠাট্টা করে তাঁরা বলতে আরম্ভ করলেন, একজন ঘুষ খায়, সুদের কারবার করে, বাবাকে দেখে না, মাকে অপমান করে, ভাইকে পথে বসায়, ব্যবসা করে অন্যায়ভাবে মানুষ ঠকায়, হীন মানসিকতার লোক, অপরকে ঈর্ষা করে, নীচতার সমস্ত রকমের দোষ তার মধ্যে আছে, কিন্তু সে নারীর মুখের দিকে তাকায় না, শুধু পায়ের দিকে তাকায়। তাহলেই কি সে মহা চরিত্রবান হয়ে গেল? আমাদের দেশে একটা কথা চালু আছে, লোকটা খারাপ হোক, কিন্তু চরিত্রটা ভাল। লোকটা মাকে পথে বসিয়েছে, বোনকে ঠকিয়েছে, ঘরের বউকে ধরে পেটায়— অর্থাৎ, বোঝা যায়, লোকটা অতি নিম্নস্তরের। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের ধারণা, লোকটার চরিত্র ভাল— যেহেতু, লোকটার মেয়েঘটিত দোষ নেই। আর একজন লোক, তিনি উদার, সৎ, কখনও মানুষের অনিষ্ট করতে পারেন না, পরদুঃখে কাতর, মাকে পথে বসাতে পারেননি, বউয়ের কথা শুনে বাবাকে হেনস্তা করতে পারেননি, নিজে না খেয়ে ভাইদের মানুষ করেছেন, ভাইদের মানুষ করতে গিয়ে নিজের

সন্তান-সন্ততিদের তেমন করে দেখেননি— কিন্তু, একই সাথে দু'জন মেয়েকে তিনি ভালবাসেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে মানুষের ধারণা, লোকটার চরিত্র খারাপ। সেক্স সম্পর্কিত এতদিন ধরে চলে আসা এই ধরনের পুরনো দৃষ্টিভঙ্গির উপরে প্রথম আঘাত হানলেন মানবতাবাদীরা।

এই প্রসঙ্গে যারা 'প্লেটোনিক' লাভার, তাদের ব্যাপারটাও ভাল করে বুঝতে হবে। তারা আসলে যৌন দাস, কিন্তু তার সঙ্গে মিশেছে তাদের পলায়নপর মনোবৃত্তি। আবার আর একদল লোক আছে, তারাও যৌন দাস, কিন্তু তার সাথে মিশেছে তাদের অনৈতিক বেপরোয়া মনোভাব। এদেরই বলা হয় 'ডিবচ', অর্থাৎ লম্পট। যে লোক শুধু সেক্সের দাস, কিন্তু জীবনে কোনও আদর্শ নেই, কোনও নীতি নেই, অনুশাসন নেই, আছে শুধু উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া মনোভাব, সেই হয় এক নম্বরের ডিবচ বা লম্পট। আর যে লোক আসলে যৌন দাস, কিন্তু তার মধ্যে পলায়নপর মনোবৃত্তি বর্তমান, সেই হয় প্লেটোনিক লাভার। এরা কেউই জীবনে সেক্সের সঠিক ভূমিকা কী, সেটা বুঝতে পারেনি। এই প্লেটোনিক লাভাররা সব ভীরু। তারা মানুষের মধ্যে যে উদার জিনিস আছে, তা দেখতে পায় না। মানুষের চরিত্রের প্রাণবন্ত দিক তারা দেখতে পায় না। ফলে দেখা গেল, ডিবচারিতেও যৌন দাসত্বের হাত থেকে যেমন মুক্তি নেই, আবার প্লেটোনিক প্রেমেও যৌন দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি নেই। তবে এটা দেখা গেছে যে, প্লেটোনিক লাভাররাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানসিক রোগের শিকার। এরাই মানসিক রোগে বেশি ভোগে। অন্যদিকে দেখা গেছে যে, যারা ডিবচ বা লম্পট, তাদের অনেককেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে বেশি কাজে লাগায়। তার কারণও খুব পরিষ্কার। কেন না যে কোনও গণআন্দোলনের সময়ে এদের অতি সহজেই মেয়েদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া যায়। যেহেতু তারা একদিকে যৌন দাস, অপরদিকে খুবই বেপরোয়া— তাই তাদের মেয়েদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু প্লেটোনিক লাভারদের সেই সাহস নেই যে বেপরোয়া ভাবে তারা মেয়েদের পিছনে লাগে। কিন্তু তারাও আসলে যৌন দাস। প্লেটোনিক লাভাররা তাদের সুনাম ছাড়া আর কিছু চায় না। এরা অত্যন্ত অনুদার, ইংরেজিতে যাকে বলে স্নিকি। এরা হল আচরণসর্বস্ব ব্যক্তি। এরা সেক্সকে জোর করে দমন করে। তাই তারা তাদের মনের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। অথচ সেক্স তো অস্বাভাবিক জিনিস নয়। প্লেটোনিক লাভার এবং ডিবচ উভয়েই সেক্সকে অস্বাভাবিক রূপে গ্রহণ করে দুটো পরস্পর বিরোধী দিক থেকে।

তাহলে সেক্সের স্বাভাবিক রূপ কী? আপনাদের বুঝতে হবে যে, মানুষের

দেহকে কেন্দ্র করেই এই চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাকে ভিত্তি করে একটা ভাবজগত বা এক ধরনের মানসিকতাও সৃষ্টি হয়েছে। সুস্থভাবে সেক্সকে একজন তখনই গ্রহণ করতে পারে, যখন সে ভালবাসার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেক্সের ভূমিকাকে এবং প্রয়োজনকেও সঠিকভাবে বুঝতে পারে। রুচির দ্বারা যখন সে নিজেকে প্রভাবিত করতে পারে, তখনই সে অনেকটা পাল্টে যায়। এই একইভাবে মানুষের প্রবৃত্তিও পাল্টে যায়। তার চাওয়া-পাওয়া এবং মানসিকতাও পাল্টে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তার রুচিগত মান অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ে না পৌঁছায়, ততক্ষণ সে যৌন দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না। এভাবে না বুঝলে যৌন দাসত্বের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয় না, বড়জোর নিজের যৌন ইচ্ছাকে জবরদস্তি দমন করা হয়। জবরদস্তি দমন করা তো আর সেক্সের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া নয়। আদিম সমাজে আমরা দেখেছি যে, সেদিন যে কেউ যে কোনও ধরনের যৌন আকাঙ্ক্ষা বোধ করুক না কেন, আপত্তি করার কেউ ছিল না। কিন্তু এটাকে কি প্রকৃত ফ্রি-সেক্স বলা চলে? না, সেটা ঠিক নয়। যার শক্তি বেশি, সেই জবরদস্তি সেটা ভোগ করত। মানুষ যৌন দাসত্বের হাত থেকে স্বাধীনতা সেদিনই অর্জন করতে পারবে, যেদিন মানুষ সামাজিক ভাবে যৌন দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে, সেদিন সে একইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত হবে। একই সাথে মানুষ সেদিন অহম থেকেও মুক্ত হবে, তার আগে নয়। অহম থেকে মুক্ত হতে না পারলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের যে প্রভাব ব্যক্তি মানসিকতার ওপর বর্তমান, তার হাত থেকে সে মুক্ত হতে পারে না।

তাই এই ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার একীকরণের (identification) প্রয়োজন। সেই একীকরণের সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে মানুষকে ব্যক্তিজীবনে একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সংগ্রামে নিয়োজিত হতে হবে। সেক্স সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তখনই পাল্টাতে থাকবে। এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে করতে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যখন দেখা যাবে, আজকে সেক্স নিয়ে যে ধরনের ঘটনা ঘটছে, সেই ধরনের ঘটনা ঘটবেই না। একমাত্র তখনই মানুষ যৌন দাসত্ব থেকে মুক্ত বা স্বাধীন হতে পারে। তখন সে মেয়েদের সাথে অশিষ্ট আচরণ করতে বা মেয়েদের সম্ভ্রম নষ্ট করতে পারে না। তখন মানুষের রুচিগত মান এমন উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাবে, যখন দেখা যাবে, মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে সে চলে বলে যার সাথে সে ভালবাসা বা যৌন সম্পর্কে সম্পর্কিত তার কোনও অশালীন আচরণ দেখলে তার সেই যৌন আবেগ সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়, কোনও আকর্ষণ আর তার মধ্যে থাকে না। তাই কোনও মেয়ে তার যৌন

আবেদনের সাহায্যে কোনও ছেলেকে দুর্বল করতে পারবে না। ঠিক একইভাবে কোনও ছেলে তার যৌন আবেদনের সাহায্যে কোনও মেয়েকেও দুর্বল করতে পারবে না। দুটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে যৌন সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ তারা স্বামী-স্ত্রী, সেই সম্পর্কের কারণে একজন অপরের কানের কাছে অনুচিত বা অনৈতিক যা হোক তাই ফিসির ফিসির করবে, সেটা হতে পারে না। যৌনক্রিয়ার সর্বোচ্চ উত্তেজনার মুহূর্তেও যদি কেউ এমন কথা বলে, যা প্রগতি বা পার্টিস্বার্থের বিরোধী, সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ে অপরের সমস্ত আবেগ, সমস্ত রস শুকিয়ে যাবে। সে তখন তাকে যৌন সম্পর্কের দিক থেকে চাইবে না। এই অবস্থায় একমাত্র যে মানুষ সেক্স সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে পারে, তার প্রতি আর সেক্স আকর্ষণ থাকে না, সেই মানুষই যৌন দাসত্ব থেকে মুক্ত। তার মানে এটা নয় যে, তার যৌন আকর্ষণই আর রইল না। সেটা নয়। কিন্তু কখনই সে সেক্স নিয়ে মাতামাতি করে না। এসব নিয়ে জল ঘোলা করে না, একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট হতে দেয় না। পার্টির স্বার্থ এবং বিপ্লবের স্বার্থকে সে আঘাত করে না।

যে জায়গায় একজন মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, সে জায়গায় অপর একজন মানুষের আকর্ষণ মুখ ফিরিয়ে কুঁকড়ে গুটিয়ে যায়। এক জায়গায় সেক্স ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব, রুচি ও শিক্ষার পরোয়া করে না, সংস্কৃতি ও মর্যাদার পরোয়া করে না, নিজেকে যৌনদাসে পর্যবসিত করে, সেক্স-এর জন্যই অন্যায় আবদারের কাছে মাথা নত করে— আবার এমন মানুষও আছে, যেখানে সেক্স-এর সম্পর্ক তাকে হীন কাজ করতে বললে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি তার আকর্ষণ শুকিয়ে যায়, তার রস শুকিয়ে যায়। এই যে যৌনতার গ্রাফ (curve)-এর দু'ধরনের ব্যবহার— একজন স্ত্রীর বা স্বামীর অন্যায় আবদারের কাছে মাথা নত করছে, আর একজন করছে না, বা পরস্পর সম্পর্ক আছে বলে একজন অন্যের অন্যায় আবদারের কথা চিন্তাও করতে পারে না। মনে করে, তার স্বামী বা স্ত্রী মহৎ কাজে ব্রতী, তার যৌনজীবনও সেই মহৎ কাজ সার্থক করার সহায়ক হওয়া দরকার, না হলে এটা একটা ঘৃণ্য, নীচ জিনিস। তাই সেক্স মানেই সুন্দর, এ ধারণা ঠিক নয়। সেক্স তখনই সুন্দর যখন তা বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক, শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনপ্রসূত ভাবনার দ্বারা, রুচির দ্বারা প্রভাবিত।

কিন্তু যারা যৌন দাস, তাদের ব্যবহার ঠিক এর বিপরীত। তাই সেক্সকে এড়িয়ে গিয়েও মুক্তি নেই, আবার সেক্স নিয়ে মাতামাতি করার রাস্তাও কোনও রাস্তা নয়। রাস্তা হচ্ছে সেটা, যেটা পার্টি ও বিপ্লবের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একজনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। প্রকৃত বিপ্লবীদের সেই রাস্তাটাই গ্রহণ করতে হবে। কাউকে আমি জোর করে পাওয়ার চেষ্টা করব না। অপরে

না চাইলে কেউ তা চাইবে কেন? কীসের জন্য চাইবে? যদি দু'জন দু'জনকে চায়, তখনই একের অপরকে গ্রহণ করার প্রশ্ন আসবে। আর একটা বিচার্য বিষয় হচ্ছে, দেখতে হবে, তাদের পারস্পারিক এই সম্পর্ক বিপ্লবকে সাহায্য করে কি না। কমরেডরা ভালবেসে বিয়ে করবে, এতে আমি সবসময়ই খুশি হই, যদি দেখি, তাদের এই সম্পর্ক বিপ্লবী আন্দোলন বা বিপ্লবকে সাহায্য করে। আর যদি তা না করে, তাহলে সেই ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার কোনও উৎসাহ নেই। বিপ্লবকে, দলকে সাহায্য না করলে বিপ্লবী অর্থে তাদের নিজেদেরও সেটা সাহায্য করবে না। হ্যাঁ, সাংসারিক অর্থে তাদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু বিপ্লবী অর্থে, বিপ্লবী জীবন গড়ে তোলার অর্থে তাদের দু'জনের কাউকেই তা সাহায্য করবে না। এখন পর্যন্ত এইসব বিষয়গুলো আমি নিজেই ট্যাকল করি। অন্য কোনও নেতা বা পার্টি বডি সাধারণত এইসব বিষয় ট্যাকল করে না, যদিও তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁরা নিজেরাই এইসব বিষয় ট্যাকল করতে পারেন এবং আজকাল কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা ট্যাকল করছেনও, একথা ঠিক। কেননা পার্টি আজ বড় হচ্ছে।

যারা আমার কাছে আসে এবং বলে, তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে— তারা আসে আমার মত জানার জন্য। আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখেছি, যে কমরেডরা আমার কাছে আসে, আমার মনে হয়েছে, তাদের মধ্যে বিষয়টা ভালবাসা নয়। এটা হচ্ছে তাদের যৌন তাড়নাকে কেন্দ্র করে একটা বুভুক্ষু মনোভাব। অর্থাৎ, সেক্স না পেলেই তাদের চলে না। তারা যতই কাব্য-সাহিত্য চর্চা করুক না কেন, দু'দিন একসঙ্গে তারা সিনেমা দেখেছে, তাতেই তারা মনে করছে যে, তারা একে অপরকে ভালবাসে। অনেক ক্ষেত্রে আমি তাদের নিষেধ করেছি। তাতে যারা খুশি মনে আমার প্রস্তাব মেনে নিতে পেরেছে, তাদের ক্ষেত্রে ফল ভালই হয়েছে। কিন্তু যারা মেনে নিতে পারেনি, আমি শেষপর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্ক মেনে নিয়েছি, তাদের বিয়ে করাটা বন্ধ করিনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি যে, তাতে ফল ভাল হয়নি। কিন্তু তবুও আমি জোর করে তাদের ওপর আমার সিদ্ধান্ত চাপাতে চাইনি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আইন করে বা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই বিষয়টা বিচার করলে এর সমাধান আমরা পাব না। তাহলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে — এই দিকটা সম্বন্ধে সমাজ নীতির প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষ যেমন মারমুখী হয়, আমরা তা হই না। আমরা বিষয়টাকে সংবেদনশীলতা ও দরদের সঙ্গে বিচার করি। আমাকে অনেক কমরেড বলেন, আমি সাধারণ কমরেডদের তুলনায় নেতাদের তীব্র সমালোচনা করি, সাধারণ কমরেডদের ক্ষেত্রে বরং এসব

ত্রুটি-বিচ্যুতি আমি খুব দরদের সঙ্গে দেখি। হ্যাঁ, তা দেখি। কিন্তু দরদের সঙ্গে দেখলেও আমি একটা জায়গায় খুব কঠোর থাকি। দরদের সাথে এইজন্য দেখি যে, সমাজের মধ্যে এই যে নৈতিকতার সংকট, আদর্শ ও নীতিহীনতা বিরাজ করছে, তার ফলে দেখছি, উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে এত বড় একটা যৌবনশক্তি আর কোনও বেরোবার পথ (outlet) না পেয়ে শুধু যৌনতার মধ্যে মত্ত হচ্ছে এবং ভালবাসা নিয়ে খেলা করছে। আজ একে ভালবাসছে, কাল তাকে ভালবাসছে। একজনকে যখন ভালবাসছে, তখন চট করে বলে দিচ্ছে, তার মতো এর আগে কাউকে কখনও এমন করে ভালবাসেনি এবং চিরকাল তাকে মনে রাখবে। তারপর দেখা যাচ্ছে, যদি তাকে পাওয়া না যায়, ছ'মাস পার হতে না হতে আবার আর একজনের সঙ্গে সেইরকম ভালবাসা এসে যাচ্ছে এবং তাকেও ওই একই কাহিনী শোনাচ্ছে। এই মূর্খরা শুধু ছটফট করছে, কোথাও স্থিতি লাভ করতে পারছে না। কারণ সত্যিকারের ভালবাসা তাদের নেই। তারা এই সমাজের ব্যাধির শিকার, পাগলের মতো নিজেদেরই নষ্ট করছে। যা পেল, তাই নেড়েচেড়ে খেয়ে জীবনকে শেষ করছে—যেটাকে আমি বলছি, মনকে মেরে দেওয়া। যা তারা পেতে পারত, তার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিল। এখানে অন্যভাবে ক্ষতি হল। তাই দরদের সাথে আমি তাদের সাহায্যের চেষ্টা করি।

তাদের এই ক্ষতিটা সরাসরি পার্টির সাথে তাদের সম্পর্ক বা বর্তমান সমাজের যা নৈতিকতা তাকে হয়ত সরাসরি আঘাত করছে না। যেমন এক জোড়া বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে স্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক নিয়ে চলে, এটা মন্দের ভাল। কী অর্থে ভাল? দলের বৃহত্তর স্বার্থে এবং সামাজিক মানের দিক থেকে ভাল। কিন্তু যদি দলের নেতা হিসাবে আমার তাকে বলতে হয়, তাহলে বলব, এই সম্পর্কের মধ্যে যদি তার মন মরে গিয়ে থাকে, তাহলে এখানে তার ব্যক্তিগতভাবে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। সেইদিক থেকে বিপ্লবেরও ক্ষতি হচ্ছে। সেটা কী? সেটা হচ্ছে এই, সে যে একজন বড় বিপ্লবী হতে পারত, কিন্তু পঙ্গু মন নিয়ে, অনিশ্চিত মন নিয়ে, ছলনা এবং অসত্যকে ধরে থেকে গতানুগতিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে তার মেধাশক্তিকে (intellectual ability) সে নষ্ট করে দিচ্ছে, বিপ্লবী অনেক উদার গুণাবলিকে সে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আবার নীতিবাগীশদের মতো ধারাবাহিক নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী একটা বিবাহিত জীবনকেই সে আদর্শ বলে মনে করছে। কিন্তু তবুও মাতলামি করার চেয়ে, ক্রমাগত পাত্র বদল করার চেয়ে, কাজকর্ম ফেলে দিয়ে শুধু প্রেম করে বেড়ানোর চেয়ে, আর চব্বিশ ঘন্টা শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার চেয়ে এটা মন্দের ভাল। না হলে দলের কাজ করার সময়ে যদিও সে বলতে থাকবে, সে তো দলের কাজ করছে— কিন্তু,

বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার উৎসাহ, তার আনন্দ থাকছে না, তার চোখ-মুখের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। তার আগেকার দায়িত্ববোধ, তেজ, বিদ্যা-বুদ্ধি নষ্ট হচ্ছে। সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে সে দায়িত্ব পালন করছে, নিয়মিত কাজ করছে এমনকী বাইরে থেকে মনেও হবে সব ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু, ক্ষতি একটা হয়েছে, যেটা সে বুঝতে পারছে না। এ কথা ঠিক, তবু তার একটা স্তর আছে, তাই এইটুকু সে করে যাচ্ছে। আবার, যাদের ভালবাসা ঠিক মনমতো হচ্ছে না বলে তাদের কিছুই ভাল লাগে না, তারা কোনও দায়িত্বই পালন করতে পারে না, তারা কোথাও মনস্থির করতে পারে না, তাদের তুলনায় এই স্তর ভাল। আবার আর একদল আছে, যারা অন্তত প্রেম-ট্রেম করে, বিয়ে-থা করে, যা হোক তাদের একরকম চলছে। তারা পরস্পরকে ভালবাসে, এই মিথ্যা সান্ত্বনা নিয়ে আছে। তারা আবার একটু আলাদা। কিন্তু আমি বলছি, এদের কোনওটাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যখন একটা বড় জিনিস পাবে, তাকে গ্রহণ করবে। তার জন্য চোখটা খোলা রাখা, মনটা খোলা রাখা প্রয়োজন— এটাই আমি বলতে চাইছি। আবার মন খোলা রাখতে গিয়ে কেউ ভালবাসা খুঁজতে ঢুকে গেলে, সেটা হবে ব্যর্থ শ্রম। তাতে ভালবাসা পাবে না। যারা ভালবাসা খোঁজার জন্য ছোটে, তারা কখনও ভালবাসা পায় না। তারা ভালবাসার নামে নিজে ঠকে, অপরকে ঠকায়। তারা যৌবনের সুন্দর সময় নষ্ট করে দেয়।

ভালবাসা সত্যি চাইলে, জনসাধারণকে ভালবেসে কাজ করতে হবে। তাহলে কর্মের মধ্য থেকেই, সহকর্মীদের মধ্য থেকেই ভালবাসা গড়ে ওঠবার হলে গড়ে উঠবে। এর জন্য মাথা খারাপ করা, মাতামাতি করা ঠিক না। ভালবাসা খুঁজতে গিয়ে ছটফট করে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ নাই। এ যারা করছে, তারা এর দ্বারা নিজেদের নষ্ট করছে, আন্দোলনকে নষ্ট করছে, দলের সংহতিকে নষ্ট করছে। বেশি দূর নষ্ট করলে, অর্থাৎ মাত্রাছাড়া হলে দল তাদের বিতাড়িত করতে বাধ্য হবে। এখানে আমি কঠোর, যদিও এটা বেদনাদায়ক। কিন্তু আমরা বিপ্লবী, আমরা এ জিনিস চাইতে বা ভালবাসতে পারি না। একটা মানুষের জন্য যত দরদবোধই থাকুক, তার জন্য একটা গোটা বিপ্লবী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিতে পারি না, ভালবেসে একটা বিষাক্ত বীজকে রাখতে পারি না। এই ধরনের আচরণগুলোর দ্বারা যদি দলের ভিতরে বিষাক্ত বায়ু ও আবহাওয়া সৃষ্টি হতে থাকে, তাহলে সেই বিষাক্ত বায়ু থেকে দলকে মুক্ত করতেই হবে। এইজন্যই আমি এ ব্যাপারে কঠোর। যদিও আমরা জানি, বহু ছেলে-মেয়ে না বুঝে, না জেনে এ জিনিসের শিকার হচ্ছে। সেইজন্য তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। তারা তো ভালবাসা চায়। তারা জনগণকে ভালবেসে দেখুক,

কমরেডদের ভালবেসে দেখুক, তাদের ভালবাসার যত অভাববোধ, চাহিদা সব মিটে যাবে। তারা বুঝতে পারবে, এর দ্বারা স্নেহ- মমতার কী উচ্চ স্তরে তারা উঠতে পারে! যৌনসম্পর্ক যে ভালবাসা একজনকে দিতে পারে, যার জন্য তারা এমন মাতামাতি করছে, কমরেডদের সঙ্গে যদি সত্যিকারের সেই দরদ ও মমত্ব, সেই রসের সম্পর্ক তাদের গড়ে ওঠে, দেখবে মনে কত টান ধরে!

এখানে আর একটা কথাও আমি বলে যেতে চাই। সাধারণ অনেক কমরেড, যারা ভালবাসার তাড়নায় এত ক্ষতি করছে, তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি দেখে, নেতারা অনেক সময়ে আমাকে চাপ দেন। বলেন, শুধু বিরক্ত করা ছাড়া, তারা আমাদের কী দিচ্ছে? তারা আমাকে বিরক্ত করছে, আমার সময় কেড়ে নিচ্ছে, অসুবিধা সৃষ্টি করছে, তবু তাদের প্রতি আমার মমতা ঝরে পড়ে— এটা ঠিক। তাদের প্রতি আমার ভালবাসা, আকর্ষণ কাজ করে। আমি বুঝি, তারা আমার সময়ের ক্ষতি করছে, তবুও তাদের ছাড়তে পারি না। এই যে তাদের প্রতি আমার এত আবেগ, এত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের এত জিনিস নিয়ে আমি মাথা ঘামাই কেন? এটা তাদের প্রতি আমার ভালবাসা, আমার স্নেহ— যেটা সমস্ত কমরেডের প্রতি আমার রয়েছে। যারা এইসব সমস্যার মধ্যে পড়ে আমার কাছে আসে, তাদের আমি ভালবাসার সাহায্যে টানতে চেষ্টা করি, তাতে তাদের মনটা বা বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে। তারা, অর্থাৎ সেই কমরেডরা, আমার ভালবাসাটা আদায় করে নেয়। কমরেডরা আমার কাছ থেকে ভালবাসা পাচ্ছে, অনেক কমরেড সেটা অনুভব করে, বুঝতে পারে। অন্যেরাও যদি এটা বুঝত, তাহলে তাদেরও বুক ভরে যেত। কিন্তু তারা বুঝতেই পারছেন না, আমি এমন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকেও তাদের এরকম একটা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এত সময় কেন নষ্ট করছি। কেন এত সময় দিচ্ছি। তারা ভেবে দেখছে না, তার বদলে দলকে তারা কী দিচ্ছে? আন্দোলনকে তারা কী দিচ্ছে? বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে তারা কী দিচ্ছে? আমি শুধু এইজন্য করছি, যেহেতু তাদের আমি ভালবাসি, আমি চাই যাতে তাদের ক্ষতি না হয়— এই তো! আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, পার্টি বড় হচ্ছে, যারা এই ধরনের সমস্যায় ভোগে, তাদের পেছনে আমার আগের মতো এত নজর দেওয়া সম্ভব নয়। আমি দলের আর পাঁচটা কাজ ফেলে এই কাজে সময় ব্যয় করতে পারি না— যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমাকে এই কাজ করতেই হয়। আমি প্রয়োজন বুঝেই এই ব্যাপারে সময় ব্যয় করি। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, মনে রাখতে হবে, যৌন মনস্তত্ত্বের ব্যাপারটা অনেকটা অন্তর্দৃষ্টির (introspection) উপর নির্ভর করে। বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাই যৌন মনস্তত্ত্ব বোঝার যথার্থ জ্ঞান গড়ে তোলে।

একথা সকলেই জানেন যে, সেক্স জীবনের একটা অংশ মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। গোটা জীবনটা শুধু সেক্সকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয় না। সুতরাং বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এবং সেক্স এই দু'য়ের মধ্যে আমাদের সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে। আর সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টাটা যদি সঠিক পথে প্রবাহিত হয়, এবং এটা তখনই সম্ভব যখন আমরা জীবনে সেক্সের যথার্থ প্রয়োজনকে বুঝতে পারি— আর তখনই সেটা বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক হয়। তাই একটা যৌন সম্পর্ককে আমরা অযথা ঘৃণা করি না। আবার একটা সম্পর্ক প্রচলিত সমাজনীতি অনুযায়ী যেটা আদর্শ স্থানীয়, সেটাও কমিউনিস্টদের বিচারে সঠিক ধারণা নয়। সঠিক ধারণা হল, সেটা বিপ্লবের পরিপূরক কি না। দেখতে হবে কোনও অবস্থাতেই যেন সেটা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতি না করে। যদি কেউ মনে করে যে, তার জীবনে সেক্স এসে গেছে, তাই তার এখন বিপ্লব নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই, তাহলে সেটা হবে তার মস্ত বড় ভুল। এরকম হলে, বুঝতে হবে, বিপ্লবীর জীবনে সেক্সের ভূমিকা কী, সেটাই সে বুঝতে পারেনি। সে নিজেকেও চিনতে পারেনি এবং নিজের মধ্যে বড় বিপ্লবী হওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে, সেটাকেও সে ধরে রাখতে পারেনি। যদি কেউ মনে করে যে, তার মধ্যে বেশি নয়, বিপ্লবী হওয়ার ওইটুকুই সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে, সে নিয়তিবাদে (fatalism) ভুগছে। তাকে বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে দলগত তত্ত্বের যতটা উপলব্ধি ঘটেছে, তার সাহায্যে তার মধ্যে যে যৌন দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে, তাকে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে হবে। এখানে নিয়তিবাদের কোনও স্থান নেই । তাই বলছিলাম, প্রত্যেক কর্মীর ব্যক্তিগত সংগ্রাম, আর সমস্ত কমরেডের সম্মিলিত সংগ্রাম, এটা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। সময় থাকতেই পার্টির শিক্ষার ভিত্তিতে নিজেদের ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করতে হবে। তবেই আমাদের বিবেকের কাছে, আমাদের রুচির কাছে, দায়িত্ববোধ এবং মূল্যবোধের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতাকে উপলব্ধি করতে পারব এবং জনগণের প্রতি আমাদের যথার্থ কর্তব্য পালনে আমরা সক্ষম হব। আমরা আমাদের সাধ্যমতো একজন কমরেডকে, একজন সহকর্মীকে তার বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য করব। কোনও কমরেড কোনও ভুল করলে দলের স্বার্থেই তাকে সাহায্য করা দরকার, সহানুভূতির দৃষ্টিতে তা দেখা দরকার। এই সাহায্য কীভাবে করবে একজন? কেউ ভাবছে, সে তার বুদ্ধি অনুযায়ী সাহায্য করবে। না, কখনই সেটা করা ঠিক না। এসব ক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধি খাটানো চলে না। এসব প্রশ্নে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করাই যুক্তিযুক্ত।

অনেক যোগ্য কর্মীরও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। যারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং ক্ষমতাবান কমরেড, এ সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট, তারাও কোনও সময়েই পার্টি সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারে না। জনগণ ও বিপ্লবের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে যারা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না, বুঝতে হবে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, ভালবাসা ও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যার প্রভাব পড়তে বাধ্য। এর প্রভাব থেকে তাদের মনে হবে যে, তারা তো রাজনীতি করছে এবং রাজনীতিতে আছে, তাই ভালবাসার ক্ষেত্রেও তারা ঠিক পথেই চলছে। না, এটা ঠিক নয়। তাদের বুঝতে হবে, তাদের ভালবাসাটা বিপ্লবের পরিপূরক কি না। সেই বিচারটাও পার্টিকেই করতে হবে। এই বিচার একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় হওয়া ঠিক নয়। এই বিচার সামগ্রিক এবং বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই। এখানে নিজের পক্ষে যুক্তি সাজানোর (rationalization) কোনও সুযোগ নেই। পার্টির বিচার অনুযায়ী চলতে সক্ষম হলে একজন আরও বড় বিপ্লবী হতে পারবে, জনগণের প্রতি আরও দায়িত্ববোধ, মমত্ববোধ ও উন্নত রুচিগত মানের অধিকারী হতে পারবে।

তাই বলছিলাম, শুধু কর্তব্যবোধ থেকেই এই ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। মনে রাখতে হবে, সমাজে বিপ্লবীরাই শ্রেষ্ঠ রসিক এবং শ্রেষ্ঠ দরদি। সমস্ত মানুষের প্রতি দরদবোধ তাদের মনে রয়েছে, সেটা তাদের গোটা মনকে ছেয়ে রেখেছে, তাই তারা জনগণকে ছেড়ে, জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে ছেড়ে, অন্য কোনও চিন্তা করতে পারে না। আর এই ধরনের লোকেরাই বড় বিপ্লবী হয়। যারা দলের সাথে কোনওমতে জড়িয়ে আছে, যারা ফরমাস মাফিক কাজ করে, যাদের নিজস্ব কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই, তারা এই জাতের বড় বিপ্লবী হতে পারে না। যাদের নিজেদের কোনও সৃজনী শক্তি নেই, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা সেই উঁচু স্তরে উঠতে পারে না, যে কোনও ধরনের দায়িত্ব পালনের মানসিক প্রস্তুতি তাদের নেই। যেহেতু তারা বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে আছে, তাই তাদের ভালবাসাটা, তাদের সেক্সটাও যেরূপেই থাক— সেটা বিপ্লবের পরিপূরক, এরকম চিন্তা ভ্রান্ত। এরকম জড়িয়ে থাকাকে বিপ্লবী হওয়া বলে না। যে বিপ্লবী, সে ব্যক্তিগত ভাবেও বিপ্লবী এবং সমষ্টিগত ভাবেও বিপ্লবী। সে বিপ্লবী আন্দোলনে যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে পারে। পার্টি থেকে কোনও পরিকল্পনা দেওয়ার আগেই, সে নিজেই সেই পরিকল্পনা নিতে পারে এবং কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এইসব জিনিসগুলো তার চোখের সামনে সবসময়ে জ্বলজ্বল করে। কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সে হতাশাগ্রস্ত হয় না। সে সাহসের সাথে যে

কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যেতে পারে। এখানেই তার সাথে অন্যান্যদের পার্থক্য। যে কোনওরকমে বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে আছে, সে বড় বিপ্লবী হতে পারে না।

বুর্জোয়া সমাজে বিপ্লবী পার্টিতে বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের জন্য কর্মীদের নিরন্তর নিরলস সংগ্রাম চালাতে হয়। সর্বোচ্চ স্তরের যিনি নেতা তাঁকেও প্রতিনিয়ত আদর্শগত স্তর উন্নত করবার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। যদি এই সংগ্রামটিকে নিরন্তর চালিয়ে না যাওয়া যায় বা কোনও কারণে দুর্বল করা হয়, তবে যে কোনও উন্নত স্তর থেকে অধঃপতিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিয়ত যে শ্রেণি সংঘর্ষ চলছে, তাতে প্রলেতারিয়েত ভাবনা আমরা বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করছি। আর বুর্জোয়া সমাজের ভাবনা-রুচি-সংস্কৃতি পরিবেশ থেকে আমাদের অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করছে। সতর্কতার দ্বারা, জ্ঞানের এবং চেতনার মান উন্নত করার দ্বারা যদি প্রতিটি মুহূর্তে আমরা সতর্ক না থাকি, তাহলে প্রতিদিনের প্রচলিত অভ্যাস, জীবনের নানা সমস্যা, রুচি-আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সংস্কৃতি, কুসংস্কারের মধ্য দিয়ে হু হু করে বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া মনোভাব বিপ্লবীদের মধ্যে ঢোকে। উই পোকা যেমন বাড়ির শক্ত খুঁটিকে ভিতর থেকে কুরে কুরে শেষ করে দেয়, অথচ বাইরে থেকে বোঝা যায় না, তেমনি বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া অভ্যাস, ধ্যানধারণা ও সংস্কৃতি বিপ্লবী দলের বড় বড় চরিত্রগুলোকে অধঃপতিত করে। একদিনের উন্নত মানের বিপ্লবীর গুণগুলি জ্ঞানের দ্বারা সদাসতর্ক প্রহরীর মতো যদি কেউ রক্ষা করতে না পারে, তাহলে তার মধ্যে ফেলে আসা দিনের শক্ত ভিতের উপর গড়ে ওঠা সর্বহারা চরিত্রের গুণাবলিও আজকের দিনের বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া অভ্যাসের চোরাগলিতে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। এইজন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষাগুলি সতর্ক করে দেয় যে, কারওর মধ্যে যখন যে প্রশ্নটি দেখা দিল, তখন তার ভেবে দেখা উচিত, এই প্রশ্নটির সঙ্গে তার বিপ্লবী হওয়ার সম্বন্ধ কী। আর ভেবে দেখা উচিত, এই প্রশ্নটি নিয়ে সে যা ভাবছে এবং অপরের সঙ্গে মত বিনিময় করছে বা নিজের মনকে সে যেভাবে বোঝাচ্ছে তার সঙ্গে তার বড় বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করার সম্পর্ক কোথায়? এটা কি তাকে বিপ্লবী হতে সাহায্য করছে, না তাকে আরও কমজোর করে দিচ্ছে, দুর্বল করে দিচ্ছে? তার এইরকম একটা ইচ্ছা, এইরকম একটা ভালবাসা, এইরকম একটা প্রেম, এইরকম একটা আবেগ— তা কি বিপ্লবের পরিপূরক?

আমি আগেও বলেছি, কোনও অবস্থাতেই সেক্স কখনই জীবনকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। এটা জীবনের একটা অংশ মাত্র। সমগ্র জীবনটা সেক্সকে

কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয় না। বরং জীবনপ্রবাহই সেক্সকে প্যাটার্ন (pattern) করে। এবং এই প্যাটার্ন করার ক্ষেত্রে জীবনের সমস্ত সংগ্রাম পরিচালনা করার বা তা গড়ে ওঠার সঙ্গে সেক্সের একটা দ্বন্দ্ব এতদিন ধরে চলেছে। তাকে আমাদের ক্রমাগত সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হচ্ছে। আর এই সামঞ্জস্য বিধানটা তখনই সঠিক হয়, যখন বিপ্লবের সংগ্রামের সঙ্গে সেক্সের দাসত্ববৃত্তি থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম কী ভাবে মিলছে, মিলে আছে এবং তা একে অপরের পরিপূরক হতে পারে, সেটা একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমরা বুঝতে পারি। অর্থাৎ, বুঝতে পারি, জীবনের যথার্থ প্রয়োজন কী। আমি আগেই বলেছি, একটা যৌন সম্পর্ককে আমরা অযথা ঘৃণা করি না। আবার একটা প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে, প্রচলিত সমাজনীতি অনুযায়ী একটা যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলেই তা আদর্শসম্মত, তাও কমিউনিস্টদের পক্ষে সঠিক ধারণা নয়। সঠিক ধারণা হচ্ছে, সেটা বিপ্লবের পরিপূরক কি না। তাছাড়া কোনও অবস্থাতে সেক্সকে এবং ভালবাসাকে বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে রেখে বিপ্লবের ক্ষতি করা উচিত নয়। অর্থাৎ, যেহেতু সেক্সটা জীবনে তার সাথে জড়িয়ে আছে বলে, ভালবাসাটা তার সাথে জড়িয়ে আছে বলে বিপ্লবের চিন্তাটা সঠিক, এভাবে চিন্তা করা ঠিক নয়। এ যদি হয়, তাহলে তারা নিজেদেরকে চিনতে পারছে না। তাদের অনেকের মধ্যে বিপ্লবী হওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে, এর দ্বারা তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা যা হচ্ছে, তারা যদি মনে করে, সেটাই একমাত্র তাদের সম্ভাবনা, সেটা তো অদৃষ্টবাদ। তাদের মধ্যে এই যৌন দৃষ্টিভঙ্গির ভুল দিকটা তো তাদের চিন্তাকে, চরিত্রকে প্রভাবিত করছে। কাজেই একে যতটা বুদ্ধি দিয়ে দল ও বিপ্লবের তত্ত্বের সহায়তায় নির্ভুল করতে পারা যায়, নিখুঁত (perfect) করতে পারা যায়, তাই হবে প্রত্যেকটি বিপ্লবীর ব্যক্তিগত ও সমগ্র কমরেডদের সম্মিলিত সংগ্রাম, একে অপরকে সাহায্য করার সংগ্রাম।

আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। এটা নিছক হাসিঠাট্টা ও রসের বিষয় নয়, কাউকে হেয় করার বিষয় নয়, তা নিয়ে কাউকে খোঁচা দেওয়ার বিষয়ও নয়। এটা হচ্ছে, সময় থাকতে একজনকে যথার্থ পার্টির জ্ঞানের দ্বারা সম্মিলিতভাবে সাহায্য করার প্রশ্ন। দেখতে হবে, কী ভাবে আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি। যদি দেখা যায়, পার্টির শিক্ষা অনুযায়ী তাকে সাহায্য করলাম, শিক্ষা দিলাম, চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও হল না— তাতে অন্তত আমাদের বিবেকের কাছে, রুচির কাছে, দায়িত্ববোধের কাছে আমরা নির্দোষ থাকব। আমাদের সাধ্যমতো আমাদের একজন কমরেডকে, একজন সহকর্মীকে তার বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলাম, তাতে মনে একটা

সান্ত্বনা থাকে। কোনও একজন কমরেড ভুল করল, তার ভালবাসাটা না হয় মিথ্যে করেই হচ্ছে, কিন্তু সে মনে করছে, এটাই ভালবাসা— তাতেই আপনারা গুজগুজ করতে শুরু করলেন, এটা ঠিক নয়। কখনও ঈর্ষাপরায়ণ হবেন না। ঈর্ষা করার মানে হল, সে জিনিসটি তার হয়নি বলে যার হয়েছে তাকে পছন্দ হচ্ছে না। না হলে যদি দলের ক্ষতি হচ্ছে বলে সে মনে করত, তাহলে তার মনে জেলাসি আসত না, বরং তার মধ্যে একটা দরদবোধ গড়ে উঠত। সে সহ্য করতে পারছে না, এই জন্য খারাপ লাগছে, তা নয়। ব্যাপারটায় ওরই ক্ষতি হচ্ছে, তাই তার খারাপ লাগছে। কাজেই সে মনে করছে, তাকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এই সাহায্যটা সে কী দিয়ে করবে? নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী পরামর্শ দিতে থাকবে? না। এখানে নিজের বুদ্ধি খাটানো চলে না। আগেই শুনলেন, এইসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ক্ষেত্রে সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ নেতৃত্বের উপর নির্ভর করাই সবসময় উচিত। এসব বিষয়ে সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের পরিবর্তে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দ্বারা, এমনকী যারা এ ব্যাপারে যোগ্য (competent) তাদের দ্বারাও অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ ক্ষমতাবান মানুষ, যাদের এই সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যাপক, তারা এই বিষয়ে কিছু সাজেশনও দিতে পারে, কিন্তু কোনও সময়ে তারা পার্টির সুনির্দিষ্ট নীতির বাইরে যাবে না। এই নীতির প্রধান কথা হল যে, জনসাধারণ ও বিপ্লবের প্রতি দায়িত্ববোধ যে কমরেডের চরিত্রে সবচেয়ে বড় বলে প্রতিভাত হচ্ছে না, বুঝতে হবে, তার মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ, সম্পত্তির মোহ নানা ফর্মে আছে। আর, ভালবাসার ক্ষেত্রেই হোক, বা অন্য পাঁচটি জিনিসে তার দায়িত্ববোধই হোক, সর্বক্ষেত্রে তাকে এগুলি প্রভাবিত করছে। ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে বিপ্লবের প্রতি আকর্ষণ তার জীবনের গতিধারাকে, ব্যক্তিগত জীবনকে, ভালবাসাকে, সেক্সকে প্রভাবিত করছে না। যদি সে নিজেকে বোঝায় যে, সে রাজনীতিতে আছে, তার তো কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, সে বরং ভালই রাজনীতি করছে— তাকে বুঝতে হবে, এটা তার একান্ত নিজস্ব বিচার্য বিষয় নয়। অর্থাৎ, এটা বিপ্লবের তত্ত্বের পরিপূরক কি না, এ বিচার তার নয়, এ বিচার দলের। দেখতে হবে, এটা বিপ্লবকে সাহায্য করছে কি না, তাকে আরও বড় বিপ্লবী করে গড়ে তুলছে কি না, আরও নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) করে গড়ে তুলছে কি না, জনগণের প্রতি মমত্ববোধ, দরদ, রুচির মান, কর্তব্যবোধ এবং পার্টির প্রতি একাত্মতা গড়ে তুলতে এবং পার্টির উচ্চতর রুচির মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে তাকে আরও বেশি সাহায্য করছে কি না এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে আসছে কি না।

কিন্তু যদি পার্টির উচ্চ রুচিগত মানের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে

বিচার করে দেখতে হবে, তার রুচিটা কোথা থেকে এল? পার্টির উচ্চ রুচিগত মানের সঙ্গে যদি তার রুচির বিরোধ হয়, যদি তার রুচিকে আড়াল করে রাখতে হয়, তাহলে তা সুন্দর হল কী করে? ফলে বুঝতে হবে, সে অসুন্দরকে (indecency) মেনে নিচ্ছে। তাকে বুঝতে হবে, দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ ধারা, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধারার অগ্রগামী রুচির কাঠামোর চেয়ে বড় জিনিস কি কিছু থাকবে? সেটা কি ওই প্রতিবেশীদের মধ্যে আছে, নাকি ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের মধ্যে আছে, অথবা অমুক বিদগ্ধ সমাজের মধ্যে আছে? এটা কি এমন যে, বিপ্লবী আন্দোলনের পরিবেশের পরিধির মধ্যে তা নেই। এ তো সত্য নয়। সমস্ত উচ্চ রুচির মান, দরদবোধ বিপ্লবী আন্দোলনেই আছে। আপনারা কি মনে করেন, শুধু কর্তব্যবোধ থেকে, দায়িত্ববোধ থেকে, বিপ্লবীরা জীবনভর লড়াই করতে পারে? ভিয়েতনামের জঙ্গলের মধ্যে যে বিপ্লবীরা লড়ছে, এমন লড়াই সন্ন্যাসীর আদর্শ নিয়ে কেউ লড়তে পারে না। জীবনভর যারা বিপ্লবের জন্য লড়াই করে যায়, মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিপ্লবের জন্য যারা লড়ে যায়, শরীর যখন ভেঙে খান খান হয়ে যায়, মনে তখনও তাদের মহত্তর বিপ্লবী তেজ থাকে। একজন এম ডি ডাক্তার, আমাকে প্রশ্ন করেছেন, আচ্ছা এত বয়সেও মাও-সে-তুং বিপ্লবী তেজ বজায় রাখছেন কী করে? আমি বলি, হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের তো বয়স হলে অবসর গ্রহণ করার সময় হয়, কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনও বুড়িয়ে যায়। তাদের তো বয়স বুড়িয়ে যাওয়ার আগেই মন বুড়িয়ে যায়, কাজেই তাঁরা বুঝতে পারেন না, যে মানুষটি চলতে পারেন না, তিনি কী ভাবে আজকের যুবকদের চেয়ে বেশি টগবগ করছেন। তাঁর মধ্যে বিপ্লবী ফারভারটা জীবন্ত, অথচ কথা বলতে গেলে হয়ত তাঁর গলা কেঁপে যাবে, কিন্তু তাঁর আবেগ এখনও একই রকম সজীব। এই যে যৌবনটা— অর্থাৎ, চিন্তার যৌবন, চরিত্রের যৌবন একজন বিপ্লবী চিরকাল বজায় রাখে কি নিছক কর্তব্যবোধ থেকে? না, বজায় রাখে, যেহেতু সে উচ্চ আদর্শ, রস ও এথিক্সের সন্ধান পায়, তাই বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ রসিক এবং শ্রেষ্ঠ দরদি। সমস্ত মানুষের প্রতি দরদবোধ তার মনের মধ্যে আছে। এ ছাড়া আর কিছু সে মনে রাখেনি, সেই দরদে তার মন ছেয়ে আছে। তাই সে জনগণ ছেড়ে তাদের মুক্তির সংগ্রাম ছেড়ে অন্য কিছু এক তিলও চিন্তা করতে পারে না। অরুচিকর কিছু একটা করা তার পক্ষে অসম্ভব। এ শুধু বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা, দলের আন্দোলনের সঙ্গে কোনও মতে জড়িয়ে থাকা, ফরমাশ মাফিক কাজ করা, কাজ পছন্দ (suitable) হলে করা, যেমন দেয় তেমন করা, নিজের কোনও কল্পনা (contemplation) নেই, নিজের কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই, নিজের কোনও সৃজনীশক্তি নেই, নিজের কোনও

সৃজনশীল ক্ষমতাও নেই, যে কোনও পরিস্থিতিতে, যে কোনও অবস্থায় বিপ্লবের যে কোনও দায়িত্ব নেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নেই — তেমন নয়। এটা হলে তবে সে করবে, এ রকম কাজ হলে তার হয়, ও রকম কাজ না হলে তার হয় না, এইসব মনোভাব নিয়ে কোনওভাবে যদি বিপ্লবের সাথে কেউ জড়িয়ে থাকে, তাহলে উন্নত রুচি অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এইসব বিপ্লবী আবার তত্ত্ব করে যে, তাদের ভালবাসাটা, তাদের সেক্সটা যে রূপেই থাকুক, তা বিপ্লবের পরিপূরক, কারণ বিপ্লবের কর্মকাণ্ড থেকে তাদের বের করে দেয়নি। আজ হয়ত দেয়নি, তারা বেরিয়ে না গেলে কাল হয়ত বের করে দেবে, অথবা একদিন বিপ্লবই তাদের বের করে দেবে। কারণ তারা শুধুমাত্র জড়িয়ে আছে বিপ্লবের সঙ্গে, এই জড়িয়ে থাকাটাকে বিপ্লবী চরিত্র বলে না। যে যথার্থ বিপ্লবী, সে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে বিপ্লবী, সে সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত সংগ্রামের মধ্যে আত্মসমাহিত থাকে। যেকোনও পরিস্থিতির সে মোকাবিলা করে, সৃষ্টিধর্মী জিনিস তার চোখের সামনে সবসময় জ্বলজ্বল করে, পরিকল্পনা আসার আগে সে নিজেই পার্টিকে কিছু পরিকল্পনা দেয়, যে কোনও পরিস্থিতিতে সে বিপ্লবী তেজ নিয়ে একটা সংগ্রাম হিসাবে কাজ করে। সে কখনও নিরুৎসাহিত অনুভব করে না। প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করবার জন্য সাহস, তেজ ও ধৈর্য তার আছে। সে বিরুদ্ধ পরিস্থিতি ভেদ করবার সাহস রাখে। এইখানে তার সাথে অপরের পার্থক্য। আর সেইজন্যই মানুষের সমাজে আলাদা করে বিপ্লবীর স্থান। বিপ্লবী অর্থে আমি ইজ্জত পাব শুধু কি বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছি, এ জন্য? কিন্তু অনেকেই এইরকম আছে, যারা কেবল বিপ্লবী পার্টির সাথে জড়িয়ে আছে।

যথার্থ ভালবাসা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটা বাস্তব ভিত্তি প্রয়োজন। যে কমিউনিস্ট তার ক্ষেত্রে ভালবাসার প্রধান কথা হচ্ছে, সে যাকে ভালবাসে তাকে কমরেড হিসাবে ভালবাসে কি? নাকি শুধুমাত্র নরনারী হিসাবে তাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে? তাকে এটাও দেখতে হবে যে একই সাথে সে জনগণকেও ভালবাসছে কি না। সেটা অফুরন্ত এবং অকৃত্রিম ভালবাসা হওয়া চাই। অর্থাৎ, সমাজের বৃহত্তর জনতার প্রতিও তার ভালবাসা থাকা চাই। একই সাথে তার পার্টিকেও ভালবাসা চাই। পার্টিগত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তার রুচি, সংস্কৃতি, মানসিক ধাঁচা এবং ধাতু কী সেটা বোঝা যায়। ভালবাসা দরকার, প্রত্যেকে চাইবেই ভালবাসতে। তার মানে কি এই যে, সকলেই ভালবাসার অধিকারী? বুঝতে হবে যে, ভালবাসা হচ্ছে একটা অত্যন্ত উন্নত মানবিক গুণ— যা মানুষকে বড় করে, ছোট করে না। লেনিন বলেছেন, ভালবাসা একটা উচ্চ মানবিক গুণ (Love is a higher human element)

— যেটা মানুষকে চরিত্র দেয়, দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে, লড়াই করতে শেখায়, মানুষকে উদার করে। যদি কেউ পার্টিকে ভালবাসার একটি বিশেষ অভিব্যক্তি (expression) রূপে ব্যক্তিজীবনের ভালবাসা পায়, তাহলেই সে তার যথার্থ সন্ধান পেতে পারে। নাহলে সে সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারে, বড়জোর সে একটা পরিবার গড়ে তুলতে পারে। অবশ্যই সাধারণ অর্থে তারও একটা মূল্য আছে। কিন্তু একই সাথে মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের ভালবাসার পরিণতি পার্টি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা। সেটা হবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তবে পার্টিকর্মীদের খেয়াল রাখতে হবে যে, সম্পর্কের মধ্যে ভালবাসা না থাকলে বিবাহ বিচ্ছেদ করার সাহসটা যেন তাদের সবসময় থাকে। সকলকে বুঝতে হবে যে, আমি যে কথাগুলো বলছি, সেগুলো তাদের ব্যক্তিগত পথনির্দেশ (guidance) হিসাবে এবং যথার্থ বিপ্লবী রুচিসম্পন্ন হওয়ার জন্য। সেদিক থেকে এই বিষয়গুলো খুবই জরুরি।

প্রত্যেককে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সমাজ পরিবেশ থেকে পুরনো নৈতিকতা চলে যাওয়ার ফলে প্রতিটি মানুষ খুব একাকীত্ব বোধ করে। পুরনো বিবেক আজ নষ্ট হয়ে গেছে। প্রত্যেকের সামনে নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজনে নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শ, নতুন দর্শন গ্রহণ করা— এইসব মহান দায়িত্বের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির যে নতুন বিপ্লবী মানসিকতা, বিপ্লবী নৈতিকতা, অর্থাৎ কমিউনিস্ট নৈতিকতা সেটা আজও অনেকেই আয়ত্ত করতে পারেননি। তার কারণ হল, আজও আমরা সমাজজীবনে বা সমাজ পরিবেশে সেই মানসিকতা গড়ে তুলতে পারিনি— যে মানসিকতায় যৌনজীবনটা সামগ্রিকভাবে গোটা জীবনেরই একটা অংশমাত্র হবে। সেরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে আমরা আজও পারিনি। অনেক সময় দেখা যায়, কিছু কমরেড আছে, যারা যৌনজীবনকে ভিত্তি করে যে ভালবাসা, সেটাকেই জীবনের সর্বস্ব বলে মনে করে। যদিও সেটা জীবনের একটা সুন্দর দিক, তাহলেও আগেই বলেছি এটা কিন্তু জীবনের গোটা দিক নয়। এটা জীবনের একটা অংশ মাত্র। একমাত্র যে ভালবাসা গড়ে উঠেছে একটা উন্নত আদর্শ ও মতাদর্শের ভিত্তিতে, সেই ভালবাসাই আমাদের কাম্য। এইভাবে যার মধ্যে ভালবাসা গড়ে ওঠে, সে তার জীবনে শুধু সেক্স নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। কিন্তু যে এভাবে পারে না, সে ভালবাসার পাত্রীটিকে না পেলে মনে করে, তার সব চলে গেল, জীবনে আর কিছুই রইল না। এমনকী যদি দল ও বিপ্লবের বিনিময়ে ভালবাসাকে পেতে হয়, তাতেও সে রাজি। কিন্তু সেই কর্মীটি জীবনে সুখী হতে পারে না। কেন না বিয়ে করার আগে সে যাই ভাবুক, বিয়ের পর যখন

যৌনজীবনটা রোজকারের বা প্রাত্যহিক বিষয় হয়ে যায়, তখন তার সেই আগেকার চনমনে মনোভাবটা আর থাকে না। আগেকার তার সেই আকর্ষণ, স্বপ্নালুতা সব চলে যায়। সুতরাং বুঝতে হবে যে, সেক্সই জীবনের সব কিছু নয়। মানুষের জীবনে সম্ভ্রম, ইজ্জতবোধ, আদর্শবাদ এসব কিছুই চাই। ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে কেউ বলতে পারে যে, সে কিছুই চায় না, শুধু ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীটিকেই চায়। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে, কথাটা ঠিক নয়। বিয়ের আগে বলবে, সে যাকে ভালবাসে তার জন্য সব কিছু দিতে পারে। কিন্তু বিয়ের পরে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিপরীত মূর্তি। আসলে পার্টিকর্মীদের বোঝা দরকার যে, তাদের আদর্শ ত্যাগ করা চলে না, জীবনে এতবড় যে লক্ষ্য, সেসব ত্যাগ করা চলে না শুধুমাত্র সেক্সের বিনিময়ে।

আমি এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলে যেতে চাই। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সমাজটা ইউরোপের সমাজ নয়। ইউরোপে ছেলে-মেয়েরা অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়। আমাদের দেশে সেই ধরনের অবাধে মেলামেশার সুযোগ আজও খুব বিশেষ নেই। যারা স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করে, তারাও সকলে ঠিক সেই ধরনের সুযোগ পায় না। মোটামুটিভাবে তারা মেলামেশা করার সুযোগ পায় এইমাত্র। ফলে কোনও ছেলে যখন একটি মেয়ের সাথে বা কোনও মেয়ে একটি ছেলের সাথে বিশেষ কোনও পরিবেশে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পায়, তখন মেলামেশার মধ্য দিয়ে, কাব্য-সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে, তাদের মধ্যে প্রচণ্ড আবেগ সৃষ্টি হয়। আসলে তখন তাদের মধ্যে যৌন আবেগ প্রবলভাবে কাজ করে। আর সেইটা পাবার জন্য তথাকথিত সংস্কৃতির, মিথ্যা কল্পনার একটা প্রলেপ লাগিয়ে তাকে টেনে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ঠকে। কেননা একে অপরের রুচিগত দিকটা পরীক্ষা করার কোনও সুযোগ পায়নি। অর্থাৎ, একে অপরের সংস্কৃতিগত মান কী, রুচি-সংস্কৃতির স্তর কী সেসব পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পায়নি। ফলে কোনও মেয়ে এরকম ছেলেকে বিয়ে করলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সে জীবনে সুখী হতে পারে না। কেননা সে সব কিছু দেখেছে রঙিন চশমা চোখে লাগিয়ে। মনে করেছে, সেই ছেলেটির মতো আর কোনও ছেলে পাওয়া যায় না। ছেলেদের ক্ষেত্রেও সেই একই ধরনের ঘটনা ঘটে। মনে করে, সে যে মেয়েটিকে ভালবাসে, সেই মেয়েটির মতো আর কেউ এত সুন্দরী হয় না। কেননা সেক্স তখন তাকে প্রতারণা করে। কিন্তু বিয়ের পর ধরা পড়ে যে, মেয়েটি কত বড় স্বার্থপর, বা ছেলেটির রুচিগত কোনও মান নেই। তখন মন বিষিয়ে যায়। তখন মনে করে, তাকে কিছুটা সংযত হয়েই জীবনটা কাটাতে হবে।

অর্থাৎ, দেখা গেল যে, রুচিগত ক্ষেত্রে দু'জনের রুচি দু'রকম। ফলে এদের মধ্যে সেই ধরনের পরিষ্কার বোঝাপড়া গড়ে ওঠে না। ফলে কী হয়? সংসারে শান্তি রক্ষা করার জন্য, ছেলেটি যে তার স্ত্রীকে কত ভালবাসে সেটা প্রমাণ করবার জন্য, এমনকী সে পার্টির প্রোগ্রামে না গিয়ে স্ত্রীর সাথে সঙ্গ দেয়। স্ত্রীর একটু শরীর খারাপ হলে পার্টিকে বলে তার স্ত্রী অসুস্থ, তাই সে প্রোগ্রামে যেতে পারেনি। এরকম বেশ কিছু কমরেড পাওয়া যাবে। কিন্তু আরেক ধরনের কর্মী আছে, যারা স্ত্রী সত্যি সত্যি অসুস্থ হলেও সে স্ত্রীকে রেখে পার্টির প্রোগ্রামে চলে যায়। আবার পার্টি স্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতি বুঝেই মানবিক দিক থেকে বিচার করে বলে, তাকে প্রোগ্রামে যেতে হবে না, তার স্ত্রীকে ডাক্তার দেখিয়ে যা করা দরকার, তার ব্যবস্থা আগে করুক। মনে রাখতে হবে, এদের মধ্যে দ্বিতীয় জন ভাল কমরেড। প্রথম জন শুধু স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকটার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ সে স্ত্রীর প্রতি বেশ কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া স্ত্রীকে সে পার্টির প্রয়োজনের গুরুত্ব ততটা বোঝাতে পারেনি।

আমাদের দেশে একটা কথা চালু আছে। সেটা হল, যারা ভালবেসে বিয়ে করে, তারা জীবনে সুখী হয় না। এই কথাটা সঠিক নয়। যে কেউ আমাদের পার্টির দিকে তাকালেই এটা বুঝতে পারবেন। আসলে ভালবেসে বিয়ে করলে তো আরও সুখী হওয়ার কথা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মেলামেশার সুযোগে তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, সেই আকর্ষণকেই তারা ভালবাসা বলে ভুল করে। আর তার সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হলে তো আর কোনও কথাই নেই। কেন না একজন, যে ভদ্র ছেলে, সে তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু ছেলেটি যদি বদ হয়, সে মেয়েটিকে নিয়ে ফূর্তি করে, তার সাথে বেড়াতে চায়, কিন্তু দায়িত্ব নেয় না। বুঝতে হবে, ছেলেটি যদি মেয়েটিকে সত্যিই ভালবাসে, তাহলে আর পাঁচটা মেয়েকে দেখলে তার মনটা আনচান করে কেন। যারা পারভার্ট, অর্থাৎ বিকৃত রুচির লোক, তাদের ক্ষেত্রেই এইসব সমস্যা দেখা দেয়। যারা বিকৃত রুচির লোক, তারা কখনও যথার্থ ভালবাসতে পারে না। তারা শুধু ভালবাসার অভিনয় করে। যারা যথার্থ ভালবাসে, অন্য পাঁচটা মেয়ে দেখলে তাদের মনটা খচখচ করে না। তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই মেয়েদের দিকে তাকায়। তাদের মন থাকে প্রশান্ত। তাদের অন্য কোনও কিছুর দিকে তাকাবার অবসরই মিলবে না। সেক্স তাদের চালনা করে না। আবার এমন অনেক ছেলে আছে, যারা প্রত্যেক মেয়েকেই বলছে, তাকে ভালবাসে, আর প্রত্যেকের সাথেই শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করছে। তাকে ভালবাসে, একথা না বললে কোনও শিক্ষিত মেয়েই তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি

হবে না। তাই ভালবাসার একটা প্রলেপ তাদের দিতে হয়। তাদের মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসার সম্পর্ক যদি হত, তাহলে সেই ভালবাসায় অপরের মন ভরে উঠত। কিন্তু যারা বিকৃত রুচির লোক তারা যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। যদি যথার্থ ভালবাসা থাকত, তাহলে বিকৃত রুচি থেকে তারা মুক্ত থাকতে পারত। যারা বিকৃত রুচিতে ভোগে, তারা কাউকে ভালবাসতে পারে না। তাদের যৌন আকাঙক্ষার উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা শুধু নিজের যৌন চাহিদা (sex urge) ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না। কিন্তু একথার দ্বারা এটা ভাববেন না যে, তারা অপরের জন্য কিছু করে না। বরঞ্চ যাদের মধ্যে এটা সত্ত্বেও কিছু মানবিক গুণ আছে, তারা বিকৃত রুচির হলেও অপরের জন্য কিছু করতে পারে। তাদের দেখানো ভাবটা (gesture) বেশি থাকে, যদিও তার আড়ালে তারা প্রত্যেকে এক একটি সেক্সসর্বস্ব ব্যক্তি। এই ক্ষতিকারক দিকগুলো তাদের মধ্যে বর্তায়।

কিছু কমরেড আমার কাছে আসে, তাদের এইসব সমস্যা নিয়ে। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে, তাদের ব্যাপারটার মধ্যে ভালবাসা বা প্রেমের কিছু নেই। কিন্তু সেসব কথা তারা কানে নেয় না। যদি পার্টি একবার বলে, তারা তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিক, তখনই তারা দু'জনে মিটিং করতে বসে যায়। মিটিং করে এসে বলে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে যাই হোক না কেন, তাদের একত্রে লড়তে হবে, তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে। কাব্য করার তো কোনও সীমা নেই। তাই তারা বলে, একজন আরেকজনের জন্য জান দেবে, বিপ্লবের জন্য যা দরকার তাই করবে, ব্যক্তিগত স্বার্থে কোনও দিন কেউ কাউকে টেনে নামাবে না। কোনও দিন যদি তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েও যায়, তাহলেও বিপ্লবের স্বার্থে সেটা মেনে নেবে। বলবে, সমাজ প্রগতির জন্য এটা প্রয়োজন। তারা একসঙ্গে বসে এই ছেঁদো কথাগুলোই আলোচনা করে। তাই যখন আমার কাছে তারা আসে, তখন বলে, তারা বিয়ে করলেও আমি যা বলব, তারা তাই করবে। এটা মাথা নেড়ে খুব বলে। তাদের ভালর জন্য যতই বোঝাই এতে দু'জনেরই ক্ষতি হবে, উন্মাদনায় তারা বুঝতে পারে না। আমি সাধারণত এই বিষয়ে জোর করি না। কিন্তু দু'দিন বাদেই দেখা যায়, কেউ কিছু করতে পারল না। এমনকী রুচির কথা বলে তারা তাদের বিবাহিত জীবনেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একটা শান্তিপূর্ণ ভদ্র যৌনজীবনও যাপন করতে পারল না। এরকম সমস্যার মধ্যে তারা পড়ে যায়। এর অর্থ কী? অর্থ হল, আমি যেটা ধরেছিলাম, সেটাই ঠিক। কিন্তু তাদের বিয়ের আগে সেসব কথা আমি তাদের বোঝাতে পারিনি। তারা শুনবে না জেনে তো তাদের উপর আমি আমার কথা চাপিয়ে দিতে পারি না। এইসব জোর করে করানো

যায় না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ডিসিপ্লিনটা আমরা খুব বেশি প্রয়োগ করি না, বিশেষ করে সাধারণ কমরেডদের ক্ষেত্রে। এটা তাদের বোঝাবার বিষয়। কিন্তু তারপরেও যখন তারা বোঝে না এবং বিয়ে করে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বিয়ের দু'দিন পরেই তারা ডিভোর্স করতে চায়। বলে, এরকম কুরুচিপূর্ণ জীবন নিয়ে তারা কী করে বিপ্লবী থাকবে। বলে, এ সম্পর্ক তাদের রুচিতে লাগে। রুচির সঙ্গে না মিললে তারা একজন পার্টি কমরেড হয়ে বিবাহিত জীবন যাপন করে কী করে? তখন তাদের এই সব বোঝাতে আমার জান কয়লা হয়ে যায়। কিছুতেই তাদের কিছু বোঝানো যায় না।

অনেক সময় দেখা যায় যে, বিপ্লবী পার্টিতে যোগ দেওয়ার আগেই বাবা-মা দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছে। যেসব ছেলেমেয়ের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে—বিয়ের পর তারা পার্টিতে যোগ দিয়ে কি কমিউনিস্ট হতে পারে না? অবশ্যই পারে। আমাদের পার্টিতে এরকম অনেক উদাহরণ আছে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে আছে, আবার চাষিদের মধ্যেও আছে। তাই কেউ যদি বলে যে, অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও বউটা যেহেতু কমিউনিস্ট হয়নি, তাই সে তাকে পরিত্যাগ করবে। তখন আমি তাকে বলি যে, অন্য কাউকে যদি ভালবাস এবং সে মেয়েটির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তখন সেটা ভেবে দেখতে হবে। সেরকম হলে একটা ভিন্ন কথা। একমাত্র সেই পরিস্থিতিতেই সেটা বিচার্য হতে পারে, নাহলে নয়।

আবারও বলছি, নরনারীর মধ্যে উচ্চস্তরের ভালবাসা তখনই হতে পারে, যখন তা জনগণ, পার্টি এবং বিপ্লবের প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। সেটাই ব্যক্তিগত জীবনে যৌনজীবনের মারফত রূপায়িত হতে চাইছে। তার সাথে বিরোধ হলে সেই ভালবাসা তারা আর চাইবে না। আমরা ভালবাসার ভিত্তিতে সেক্স চাই এবং তা ইজ্জতের ভিত্তিতে চাই, পার্টির স্বার্থের প্রয়োজনেই চাই, বিপ্লবের জন্যই চাই। আবার, অন্য কোনও কমরেডের সাথে লড়ালড়ি করে তা চাই না। লড়ালড়ির প্রশ্ন এলে, বিপ্লবী সঙ্গে সঙ্গে বলবে, না, সেই সম্পর্ক সে চায় না।

এবার অন্য একটি দিক আলোচনা করতে চাই। সেটা হল, অনেক কমরেড ব্যক্তিজীবনে সেক্স এবং ভালবাসার যথার্থ রূপকে বুঝতে না পেরে এক ধরনের মানসিক রোগী হয়ে যায়। অর্থাৎ, এক এক সময় তাদের আচরণটা খুবই স্বাভাবিক এবং যুক্তিপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই তারা অস্বাভাবিক আচরণ করে। তারা নিজেদের কর্মক্ষমতা হারায়, উৎসাহ হারায়, প্রাণচাঞ্চল্য হারায়, সারা জীবনই ভোগে এই মানসিক রোগে। তাদের মনে হয়, তারা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। কারও ক্ষেত্রে দেখা যায়, যার সাথে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, সেই বিয়ে

হয়নি এবং পরবর্তীকালে জীবনে যাকে পেল, তুলনায় সে অনেক ভাল, কিন্তু আগের জনের প্রতি সেক্সের আকর্ষণ সে ছাড়তে পারে না। যে কোনও সচেতন কর্মী জানে যে, এইসব উৎপাত তার মধ্যেও আসতে পারে এবং এলে কীভাবে সে তা নেবে। সে নেতৃত্বের সাহায্য নিয়ে এর থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। কারণ সে জানে, কাউকে গ্রহণ করার হলে তাকে গ্রহণ করবে। এই গ্রহণ করবে, কথাটার মানে কী? এর যথার্থ মানে হল, যেটা তার চরিত্রকে আরও বড় করবে এবং তার জ্ঞান, তার বুদ্ধিবৃত্তি, তার সাধনাকে আরও শাণিত করতে সাহায্য করবে। ঔদার্য, সাহস এবং কমিউনিস্ট হিসেবে চরিত্রের যে উদারতা তার থাকা দরকার, সেইসব গুণাবলি তার মধ্যে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তবেই এ সম্পর্ক তার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। তখন তাকে সে খুশি মনেই গ্রহণ করবে। অপর পক্ষেরও তাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি থাকবে না। তখন সে বুভুক্ষুর মতো আচরণ করবে না। যাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকে, তাদের এসব বিষয় নিয়ে কোনও গোলমাল হয় না। তারা জনগণ এবং কর্মীদের সাথে শুধু যোগাযোগই নয়, এমনকী সখ্যতাও বজায় রেখে চলে। তাদের সাথেও তাদের ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ভালবাসার মধ্যে যে আবেগের দিক আছে, তারও হাজার একরকম অভিব্যক্তি ঘটে—যেমন ভগ্নীকে, ভ্রাতাকে, অন্য কমরেডকে সে যে ভালবাসে, তার রূপ ভিন্ন ভিন্ন। আবার স্ত্রীর সঙ্গে ভালবাসার রূপ একেবারে ভিন্ন।

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এইসব ভালবাসার বিষয় নিয়ে কখনও হাসি-ঠাট্টা করতে নেই। যখন একটা সম্পর্ক জানা হয়ে গেছে বা মনে হয়েছে, একজন কমরেডের সাথে অন্য কোনও কমরেডের সম্পর্ক আছে, কিন্তু সেটা পার্টি স্বীকৃত নয় — সেটা নিয়ে বন্ধুদের হাসি-ঠাট্টা করা, চোখে চোখে ইশারা করা, এসব কখনই উচিত নয়। তাদের কাজ হচ্ছে, যদি তারা মনে করে, এই সম্পর্কের ফলটা ভাল হবে না, তখন সেটা পার্টি নেতৃত্বকে জানাবে। আর যদি মনে করে, এতে অন্যায় কিছু নেই এবং কোনও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাহলে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু, একথাও জানতে হবে যে, এটা পার্টির দ্বারা স্বীকৃত সম্পর্ক কি না। যতক্ষণ পর্যন্ত পার্টি তাদের সম্পর্কটিকে বিবাহের স্বীকৃতি না দেয়, ততক্ষণ অন্যদের তা নিয়ে, অর্থাৎ এইসব নিয়ে গল্পগুজব বা হাসি-ঠাট্টা করা ঠিক নয়। এইসব বিষয় মেনে না চললে ভবিষ্যতে অনেক বিপত্তি দেখা দিতে পারে। এমন হতে পারে যে, দু'জন কমরেড আগে নিজেদের মধ্যে কোনও ভালবাসার কথা ভাবেনি, কিন্তু অন্যদের হাসি- ঠাট্টার ফলে তাদের মধ্যে সেরকম একটি সম্পর্ক গড়ে উঠল। এর ফল ভাল হয় না। তাই এই ধরনের

হাসি-ঠাট্টা করা ঠিক নয়। কোনও সম্পর্কের কথা যখন নেতৃত্ব জেনে ফেলেছে, বা এ ব্যাপারে নেতৃত্বের সম্মতি আছে, তখন সেটা নিয়ে আনন্দ করাতে, ঠাট্টা করাতে, আপত্তি নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটা সাধারণ আকর্ষণ থেকে ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে পছন্দ করে। তাদের পরস্পরের সাথে মেলামেশা করতে ভাল লাগে। তাতে কোনও আপত্তি করার কিছু নেই, যদি তার মধ্যে অরুচিকর কিছু না থাকে এবং এই মেলামেশাটা তারা সকলের সামনেই করে, লুকিয়ে করে না, লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছু করে না। কিন্তু এ নিয়ে অহেতুক ঠাট্টা-ইয়ার্কি করলে যদি ওদের মনে এখনও যা আসেনি, সেটা আসতে সাহায্য করে, তাহলে সেটা ঠিক নয়। আবার কারওর যদি যথার্থই কারওর সাথে প্রেমের সম্পর্ক থাকে এবং সেটা যদি পার্টির দ্বারা স্বীকৃত হয়, তাহলে অন্যের সাথে তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে পারবে না কেন? দু'জনের মধ্যে যথার্থ ভালবাসার সম্পর্ক থাকলে, সেটা সকলের কাছেই আনন্দের বিষয়। সেক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে রসালাপ করতেও কোনও অসুবিধা হয় না।

কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনও কোনও মেয়ে একটু 'আলট্রা' ধরনের, একটু বেশি মাত্রায় 'ফ্রি'। তাদের বিশেষ কোনও জড়তা নেই। তাদের মধ্যে একটু বেশি মাত্রায় বাড়াবাড়ি থাকে। কখনও এর পাশে বসল, কখনও আর একজনের পাশে বসল। একজনের সাথে চার-পাঁচ দিন ঘুরে বেড়াল, আবার তার পরেই আর একজনের সাথে ঘুরে বেড়াল। এইসব মেয়েরা যত বিপত্তির সৃষ্টি করে। যদি জিজ্ঞেস করা যায়, যার সাথে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কি সে ভালবাসে? তখন বলবে, না, সে অন্য এক কমরেড সম্পর্কে ভাবছে। অথচ যার সম্পর্কে মেয়েটি চিন্তা করছে, তার সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে ওইরকম কোনও কিছু ব্যাপার নেই। তার হয়তো রুচির ধরনটা অন্যরকম। সে এইসব বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না। সে বলে, মেয়েটি যদি তাকে বুঝতে না পারে, তাহলে ভালবাসার দরকার নেই। ওটা তো হ্যাংলামি ছাড়া কিছুই নয়। মেয়েটি ছেলেটিকে একটা জায়গায় তার জন্য অপেক্ষা করতে বলে। ছেলেটি ওই ঠাঠাপড়া রোদ্দুরে দাঁড়াতে রাজি না হওয়ায়, মেয়েটি ধরে নিল যে, ছেলেটি তাকে ভালবাসে না। আর যদি ছেলেটি তার জন্য সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করত, তাহলে তার কাছে এটা প্রমাণ হত যে, ছেলেটি তাকে ভালবাসে। এইভাবে ভালবাসার বিচার হয় নাকি? একথা ঠিক যে, কোনও ছেলে যখন কোনও মেয়ের সাথে স্বাভাবিক ও সরলভাবে মেলামেশা করে, সেটা সে করে, কারণ তাকে তার ভাল লাগে। ফলে মনে কিছু না রেখেই সে সেভাবে মেলামেশা করে। আবার অপরদিকে যে মেয়েরা এতদিন বদ্ধ ঘরে আটকে ছিল, কিন্তু আজ

বাড়ি থেকে বের হতে পারছে, শোষিত মানুষের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছে, একটা উদার পরিবেশে মেলামেশার সুযোগ পাচ্ছে, তখন তারাও অনেকের সাথেই খোলামেলা ভাবেই চলাফেরা করে। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ আছে, যাদের আমরা বাঙাল ভাষায় বলি 'ট্যালা', যাদের বোধভাষ্যি বেশ কম। একটা ছেলে যে প্রেম করার জন্যই তার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটাও সে বুঝতে পারে না। সে বলে, এতে কী আছে? ছেলেটি তো আমাদের পার্টির একজন কমরেড। ফলে তার সাথে ছেলেটি কথা বলবে, তাকে দু'দিন বাড়িতে পৌঁছে দেবে, এতে আপত্তি করার কী আছে? অর্থাৎ, মেয়েটি বুঝতেই পারছে না, কেন ছেলেটি তার পিছন পিছন ঘুরছে, কেন সে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। ছেলেটি মেয়েটিকে বলে, তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে তার কোনও অসুবিধা হবে না। হয়তো বাড়ি ফিরতে মেয়েটির একটু বেশি রাত হবে, কিন্তু তাতে ছেলেটির কোনও অসুবিধা নেই। এইসবের মধ্য দিয়ে যে কী বিপত্তির সৃষ্টি হয়, মেয়েটি সেটাও বুঝতে পারছে না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথার্থ ভালবাসা থাকলে এরকম পাগলামি করার দরকার কী? এতে আসলে উভয়েরই ইজ্জত যায়, সম্ভ্রম যায়, ব্যক্তিত্ব যায়। এতে দু'জনেরই ক্ষতি হয়। দু'জনেরই মনে রাখা দরকার যে, তাদের পরস্পর মেলামেশার মধ্যে একটু সংযত আচরণ থাকা দরকার। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোনও ছেলে কোনও মেয়ের সাথে এইভাবে মেশার মধ্য দিয়ে মনে করে, মেয়েটি বোধহয় বুঝেছে যে, ছেলেটি তাকে ভালবাসে। এই কথা যখন মেয়েটিকে ছেলেটি বলল, মেয়েটি তো ছেলেটির কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল। মেয়েটি বলল, ছেলেটি তাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে, তার থেকে সে কেন ধরে নেবে যে, মেয়েটি তাকে ভালবাসে। তখন ছেলেটি আর কোনও কথা শুনতে চায় না। সে তো ধরে বসে আছে যে, মেয়েটিও ছেলেটিকে ভালবাসে। এইসবের মধ্য দিয়েই দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ছেলেটি 'অ্যাবনরমাল' হয়ে যায়। ফলে আমি আপনাদের বলতে চাই যে, আপনাদের সকলেরই কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার।

কিন্তু বিবাহিত জীবনেও একটা আর্ট থাকা দরকার। বুর্জোয়া মানবতাবাদীরাও বলেছেন, রুচিবর্জিত ভালবাসা শুধু দৈহিক ক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয় (Sex without art is nothing but a physical gesture)। সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে আবেগ, যেটা সেক্সকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, সেটা রুচির ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। আবার আমি বিবাহিত কমরেডদের মধ্যে খুব কম দেখেছি যে, তারা আর পাঁচ জন কমরেডের সাথে, তাদের স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে আনন্দের সাথে

আলোচনা করে। সবাই জানে, তারা বিবাহিত এবং তারা গভীরভাবে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। অথচ অন্য কমরেডদের উপস্থিতিতে দু'জনের সামনাসামনি দেখা হলে বোঝা যাবে না যে, তারা পরস্পরকে ভালবাসে। মনে হবে যেন তাদের দু'জনের মধ্যে কোনও সম্পর্কই নেই। অর্থাৎ, তাদের আচরণের মধ্যে কোনও স্বাভাবিকতা নেই। এটা ঠিক নয়। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি যে, দু'জনের মধ্যে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, তাদের আচরণের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা থাকবে না, তাদের আচরণ রুচিসম্মত স্বাভাবিক হওয়া উচিত। আবার, অন্যেরা যারা বিবাহিত নয়, তাদের মধ্যেও একদল অত্যন্ত সাধারণ কমরেড, যারা পার্টির শিক্ষায় সেভাবে শিক্ষিত নয়, সেইসব কমরেড তাদের অজ্ঞাতসারেই এই স্বাভাবিক সম্পর্ককে ভালভাবে দেখতে পারে না। তারা এদের সবসময় ছোট করার চেষ্টা করে। অপরের মধ্যে এই আনন্দময় সম্পর্ককে তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। এরকম ঘটনাও ঘটে। আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে, এই কমরেডদের আমরা কতটা সাহায্য করতে পারি। আবার যেখানে সম্পর্ক স্বাভাবিক, সেখানে রসালাপ করায় কোনও ক্ষতি নেই এবং সেটা দু'জনেই খুশি মনেই গ্রহণ করে, আনন্দের সাথেই গ্রহণ করে। আমরা জানি, এদের সম্পর্ক পার্টির দ্বারা স্বীকৃত। এতে তারাও আনন্দ পায়, আমরাও আনন্দ পাই। তাই বলছিলাম যে, প্রতিটি কমরেডের ক্ষেত্রে এই সুন্দর সম্পর্ক গড়ে দেওয়ার জন্যই আমাদের চেষ্টা করা দরকার। আবার, মনে রাখতে হবে যে, কোনও ক্ষেত্রেই জোর করে সম্পর্ক করিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এতে ফল ভাল হয় না। ছেলেমেয়েরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু সেই ভালবাসা যদি পার্টির কাজে ফাঁকি দিতে শেখায়, কাজে উৎসাহিত বোধ করার বদলে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে— সেটা আমাদের মোটেই কাম্য নয়। এই ধরনের দুর্বলতাকে আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। এতে পার্টির ক্ষতি হয়, তাদেরও ক্ষতি হয়। এই ধরনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

ইতিমধ্যেই আমার কাছে কিছু লিখিত প্রশ্ন এসে গেছে। তাতে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, আমার আলোচনা এই কমরেডরা ঠিক মতো বুঝতে পারেনি। তারা আমার আলোচনা থেকে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। যেমন আমি বলতে চেয়েছি, সেক্সকে বর্জন করার কথাটা অবাস্তব। আবার একই সাথে আমি সেক্স-স্লেভারি বা যৌন দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি অর্জনের কথাও বলেছি। তার মানে এটা নয় যে, জীবনে সেক্সের প্রয়োজন নেই। আমি বলতে চেয়েছি, জীবনে সেক্সের যথার্থ প্রয়োজন কী, সেটা বুঝতে হবে। এই প্রয়োজনকে ঠিক ঠিক না বুঝলে আমরা যৌন দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি অর্জন

করতে পারব না। মানুষ কোনও মনগড়া তত্ত্ব বা ফর্মুলার দ্বারা যৌন দাসত্ব বা তার প্রভাব থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারে না। কোনও লোক যদি সেক্সকে বর্জন করতে চায় বা সেক্সকে ঘৃণা করে, তার মানে এরকম নয় যে, সে যথার্থ যৌন দাসত্ব থেকে মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হল। বরঞ্চ উল্টোদিক থেকে দেখা যায় যে, সে আরও বেশি করে যৌন দাসে পরিণত হল, নানা দিক থেকে নানা ধরনের নীচ প্রবৃত্তির শিকার হল। সে সংকীর্ণমনা হয়ে পড়ল, অহংবোধে আচ্ছন্ন হল, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হল। আমি বলতে চেয়েছি যে, সেক্সের অত্যধিক শিকার হওয়া বা সেক্সকে বর্জন কোনওটাই যৌন দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা নয়। অর্থাৎ নিষ্কাম ভালবাসা অথবা লাম্পট্য— কোনওটার মধ্যেই যৌন দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই।

আবার ভালবাসার বিষয়টা এক গ্লাস জল খাওয়ার মতো ব্যাপার নয়। মানবতাবাদীদের এই কথা থেকে ইউরোপের একদল কমিউনিস্ট তুমুল কাণ্ড করতে আরম্ভ করল। আর মনস্তাত্ত্বিক সিগমন্ড ফ্রয়েড এসে দেখালেন যে, মানুষের অনুভূতির মধ্যে বহু জিনিস— যেমন, পিতা ও কন্যার সম্পর্কের মধ্যে, মা ও ছেলের সম্পর্কের মধ্যে পর্যন্ত সুপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা কীভাবে কাজ করে, কীভাবে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। এমনকী মা ও ছেলের মধ্যে উচ্চ আদর্শের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সকল অবস্থায়, সকল পরিস্থিতিতে, তাকে রক্ষা করতে পারে না। এইসব যখন ফ্রয়েড খানিকটা বাস্তবকে উন্মুক্ত করে দেখালেন, তখন ইউরোপে কমিউনিস্ট নামধারী একদল বলল, এই তো ঠিক কথা। কাজেই এই সেক্স নিয়ে, প্রেম-ভালবাসা নিয়ে এত বাধ্যবাধকতার কী আছে? এটা করো না, ওটা করো না, এটা ভাল, ওটা মন্দ— এসবের দরকার কী? মানুষের ক্ষুধা পেলে যেমন খাবার খায়, তেষ্টায় যেমন জল খায়, তেমন আমার যদি কাউকে ভাল লাগে, হোক না এক মুহূর্তের জন্য, হোক না অফিসে একটু অবসর পেলাম তখনই ভাল লাগল, তাতে যদি আমাদের মধ্যে একটা যৌন সম্পর্ক গড়েই ওঠে, তা নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কী আছে? আমরা বিপ্লবী থাকলেই হল, কাজ-কর্ম করতে পারলেই হল। এই বলে ইউরোপে কমিউনিস্ট নামধারী একদল একেবারে তুলকালাম আন্দোলন আরম্ভ করে দিল। দাবি তুলল, তাদের যৌন স্বাধীনতা দিতে হবে, বিপ্লবের জন্য এটা দরকার। লেনিনের সময়েই ইউরোপে এটা ভয়ানক সমস্যা হিসাবে দেখা দিল। এই প্রসঙ্গে লেনিন ক্লারা জেটকিনের সঙ্গে আলোচনায় বললেন, এইভাবে যারা ভাবছে, তারা সমস্ত জিনিস গোলমাল করছে। হ্যাঁ এটা ঠিক যে, আমরা নৈষ্ঠিক নই, সেক্স নিয়ে আমাদের গোঁড়ামি নেই। আমরা চরিত্রটাই দেখি, মানুষ

বড় কি না, তার দ্বারা সে বড় হল কি না— এটাই দেখি। এটার মানে কী এই যে, বিপ্লবী আন্দোলনে আছে বলে, দলের কাজ করছে বলে কেউ যা ইচ্ছা তাই করল। আবার যুক্তি করছে, এতে তার কোনও অপকার হয়নি, কারণ সেক্সে তার ব্যাপার যাই থাকুক, সে তো মন দিয়েই দলের বা বিপ্লবের কাজ করছে। তার পক্ষে তো ফলটা ভালই বর্তাচ্ছে। লেনিন বললেন, না, বিচারটা এত সোজা নয়। তারা দুটো জিনিস গোলমাল করছে। একটা হচ্ছে, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং কূপমন্ডুকতা থেকে পুরুষ ও নারী উভয়কেই মুক্ত করার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, ধর্মীয় অনুশাসন এতদিন ধরে যে কু-আচার, যে ভ্রষ্টাচার, যে দুর্নীতিগ্রস্ততা পুরুষের মধ্যে এনে দিয়েছিল, আর একদিকে মেয়েদের মধ্যে যে হীনমন্যতা, গোলামি এনে মানব সমাজের অর্ধেক শক্তিকে অকর্মণ্য করে দিয়েছিল, তাদের এসবের হাত থেকে মুক্ত করা। পুরুষদের মর্যাদার ভিত্তিতে, সম্ভ্রম, রুচি এবং মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে দাঁড় করানো দরকার। মেয়েদেরও স্বাধীনতার ভিত্তিতে, নারীত্বের মর্যাদার ভিত্তিতে দাঁড় করানো দরকার। উভয়কে সুস্থ সংস্কৃতির ভিত্তিতে দাঁড় করানো এবং পরস্পর পরস্পরকে যাতে গুণের ভিত্তিতে, আদর্শের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে পারে, একে অপরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে এবং তার ভিত্তিতে যাতে তারা সেক্স এবং ভালবাসার এই অনুভূতিকে গ্রহণ করতে পারে— এটা প্রয়োজন।

এইসবের রাস্তা খুলে দেওয়ার জন্য এল মানবতাবাদী আন্দোলন, রেনেসাঁস, বুর্জোয়া বিপ্লব। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক জগতে পরিবর্তন এইসব সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুলে দিল। পরবর্তী পর্যায়ে মার্কসবাদীরা তাকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল। বুর্জোয়ারা নরনারীর বিবাহিত জীবনকে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেছে। কিন্তু বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা তত্ত্বে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধারণা নিয়ে এলেও ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিসম্পত্তি ও ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারেনি। ফলে ব্যক্তিসম্পত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অহম এবং ব্যক্তিগত কোন্দল, ঈর্ষা, রেষারেষি থেকেও সমাজ মুক্ত হতে পারল না। ফলে, যতই তারা উন্নত রুচি-সংস্কৃতির কথা বলুক না কেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত বিষয়, অর্থাৎ, ব্যক্তি ধারণা থেকে ভালবাসা এবং সেক্সকে তারা মুক্ত করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই এই রাস্তা বেয়েই ধর্ম যেমন সমাজে অনিষ্ট করেছে, তেমনি বুর্জোয়া মানবতাবাদীরাও সমাজকে কিছুটা বিকশিত করলেও শেষপর্যন্ত অনিষ্টকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা নরনারীর অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলে নতুন আদর্শ যেটা ব্যক্তিসম্পত্তিজাত

মানসিক জটিলতা থেকে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতিকে মুক্ত করবে, এমন কী তার যৌনতার ধ্যানধারণা, ভালবাসার অনুভূতিকে পর্যন্ত মুক্ত করবে, সেটা হচ্ছে কমিউনিজম বা সাম্যবাদের আদর্শ— বিপ্লবের মারফত পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে যার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হবে। কাজেই সর্বহারা বিপ্লবই মানুষের ভালবাসাকে, যৌনতাকে যথার্থ স্বাধীনতার পথ খুলে দেবে । এই স্বাধীনতা বিপ্লবের পথেই প্রতিষ্ঠিত হবে। বিপ্লবের কাজ ফেলে দিয়ে প্রথমেই যৌন স্বাধীনতার চর্চা করতে বসলে, এর মারাত্মক পরিণতি হবে বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতার সুরে বাঁধা পড়া। বাজনা যেমন সুরে বাঁধা থাকে, তেমনি স্বাধীনতা, যৌনতা, মুক্তির প্রশ্নগুলো বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতার সুরে বাঁধা থাকে। এই সুরে সবাই বাঁধা পড়ছে। ফলে সেক্সের মুক্তি হবে না। যৌন স্বাধীনতার নামে সব সেক্সের গোলাম হবে, প্রকৃতির দাসত্ব করবে, যৌনতার দাসত্ব করবে। প্রকৃত যৌন স্বাধীনতা হচ্ছে সেক্সকে জয় করা, আজ্ঞাধীন করা, নিজের অধীনে নিয়ে আসা। আমি সেক্সের দাসত্ব থেকে নিজে মুক্ত— এই কথাটার মানে প্রকৃতিকে আমি বশীভূত বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছি। কিন্তু কেউ নিজে যদি সেক্সের দাস থাকে, উত্তেজনার দাস থাকে এবং তার দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে সেক্সের দাসত্ব থেকে সে মুক্ত হবে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মনোভাবনা এবং মানসিক জটিলতার ধারণা থেকে যদি ভালবাসা এবং সেক্সকে কেউ মুক্ত করতে চায়, যৌন দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা যদি কেউ পেতে চায়, তাহলে তাকে লড়তে হবে সর্বহারা বিপ্লবের জন্য। আমাদের মনে রাখা দরকার, সর্বহারা বিপ্লবই প্রকৃত যৌন স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করবে। এইভাবে না বুঝে অজান্তে বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে যৌন স্বাধীনতার চর্চা, ভালবাসার স্বাধীনতার চর্চা করলে বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের ভালবাসার স্বাধীনতার ধ্যান-ধারণার চর্চার চক্করে এবং ফাঁদে আমরা পা দেব। অর্থাৎ, ভালবাসা ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবে বটে, কিন্তু ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা থেকে, অহম থেকে, অহমের দাসত্ব থেকে, সম্পত্তিবোধের দাসত্ব থেকে, ভালবাসা এবং সেক্সকে আমরা মুক্তি দিতে পারব না। ফলে, ব্যক্তির বিকাশের রাস্তাও খুলে দিতে পারব না।

লেনিন নরনারীর পরস্পর ভালবাসা সম্পর্কে এই রাস্তাটি সামনে তুলে ধরলেন। ধরে বললেন, তাহলে এই বিষয়ে মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি (approach) কী হবে। এই প্রসঙ্গে লেনিন তথাকথিত এক গ্লাস জলের তত্ত্বের অবতারণা করে বললেন, ওদের কথা হচ্ছে তৃষ্ণা পেলে মানুষ যেমন জল খায়, তেমন কোথাও

যদি এরকম একটা সম্পর্ক হয়, তা নিয়ে এত মাথা ঘামাবার দরকার কী? লেনিন বললেন, কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি আদৌ ঠিক না। তৃষ্ণা পেলেই কি মানুষ নর্দমার জল খায়? কারও খুব তৃষ্ণা পেয়েছে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু তার জন্য কেউ কর্দমাক্ত ড্রেনের নোংরা জল খাবে? না। বরং ভাল জল না পেলে সে অপেক্ষা করবে। কোথাও গিয়ে একটু পরিষ্কার জল পাওয়া যায় কি না তার জন্য যত কষ্ট হোক, দৌড়তে থাকবে। কারণ সে জানে, তৃষ্ণা পেলেও যদি সে নর্দমার জল খায়, তবে তার শরীর অসুস্থ হবে। বেঁচে থাকার জন্য যে জল খাওয়া, এই নোংরা জল খেলে তা তার বেঁচে থাকার পথেই বাধা সৃষ্টি করবে। তাহলে তৃষ্ণা পেলে জল খেতে আপত্তি নাই, কিন্তু তার জন্য তো মানুষ বিশুদ্ধ জল পান করে এবং তা পাওয়ার চেষ্টা করে। সে ড্রেনের জল পান করে না। এ কথার দ্বারা লেনিন কী বোঝাতে চেয়েছেন? ধরুন, একজন সংসারী, তার সামনে সাংসারিক এবং পারিবারিক আদর্শই হচ্ছে বড়। তার জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে ভাল করে পরিবার প্রতিপালন করবে, সংসার ভাল করে চালাবে, সকলের দায়দায়িত্ব বহন করবে, ভাই-বোনকে দেখবে, মা বাবার দুঃখ-দুর্দশা দূর করবে। এই তার আদর্শ। অন্য একজনের সামনে সমাজ সংস্কারের আদর্শই বড়। আবার একজন বিপ্লবী, তার সামনে বিপ্লবী হওয়াটাই জীবনের আসল উদ্দেশ্য। এর যে কোনওটা যদি কারওর জীবনের আদর্শ হয়, তাহলে সে তার জীবনের আদর্শকে প্রস্ফূটিত করতে, বিকশিত করতে, তার যে যৌন তৃষ্ণাটি পেল, অর্থাৎ, যার সম্বন্ধে তার এই অনুভূতিটি এল, পান করার আগে তা ভাল কি খারাপ সে বিচার করে দেখবে না? আর সে যদি বিপ্লবী হয়, তাহলে জল পানের আগে সে দেখবে না, এটা বিপ্লবী চরিত্র বিকশিত করতে তাকে সাহায্য করবে, নাকি তার আদর্শের সমস্ত ধাঁচাটা ধ্বংস করবে? তৃষ্ণা তার পেয়েছিল ঠিকই, পান করতেও তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু সে তো ড্রেনের জল পান করল, যা পান করার দ্বারা তার যা আদর্শ, তার যা উদ্দেশ্য, তার যা জীবনের নীতি, তাই ধসে গেল। কারণ, সে পান করল ড্রেনের জল। বিপ্লবীর ক্ষেত্রেও এইভাবে বুঝতে হবে। বিপ্লবীকেও সঠিক পথের সন্ধান করতে হয়, সে খোঁজ করে ভাল জলের। আপনারা আবার আমার এই খোঁজ করা বলতে অন্য কথা খুঁজতে যাবেন না। খোঁজা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি, একমাত্র স্বাভাবিক পথেই তা আসবে। যদি ভালবাসা আসে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তা আসবে। দেখতে হবে, তা যথার্থ কি না। এর চেয়ে বড় মাপকাঠি আমার জানা নেই।

যে চিন্তা-ভাবনা, যে অনুভূতি একজনের মধ্যে এল, যাকে কেন্দ্র করেই তা আসুক, তা গ্রহণ করবার দ্বারা সে কোথাও এতটুকু নামবে কি না, তার আদর্শের

দিক থেকে এতটুকু হলেও সে পিছনে সরে আসবে কি না, নাকি আরও বড় মানুষ হতে তা তাকে সামনে ঠেলে দেবে, এই হচ্ছে বিচারের মাপকাঠি। আমার একটা লেখায় আছে, প্রগতি কাকে বলে, কোন জিনিস সুন্দর, কোন জিনিস উন্নত ধরনের? যে জিনিস মানুষকে সামনে ঠেলে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, গতির যে বেগটা ঘটনাকে, সমাজকে, মানুষকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়, তাকে আমরা বলি প্রগতির পথে গতি— অর্থাৎ, সামনের দিকে এবং উপরের দিকে গতি (movement onward and upward)। আর গতির যে দিকটা পিছনের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়, তাকে আমরা বলি প্রতিক্রিয়া।

ঘটনা এবং পরিবেশকে কেন্দ্র করে নিয়ত সতর্ক না থাকা, কতকগুলো অনুশাসন মেনে না চলা, এর প্রাদুর্ভাব আজকালকার দিনের বেশ কিছু ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফলে বিপত্তি আসছে। আগেকার দিনে কী ছিল? সচরাচর ভাই-বোন বড় হয়ে গেলে বাড়ির লোকের সদা সতর্ক নজর থাকত যে, তারা যেন এক ঘরে না ঘুমায়, এক ঘরে আলাদা ফিস-ফিস করে কথাবার্তা না বলে। এমনকী মেয়ে বড় হয়ে গেলে মা নজর রাখত, যাতে বাবার ঘরে একা বাবার পদসেবাও সে না করে। কেন এত সব ব্যাপারে চোখ ছিল? আগে মানুষের এই শিক্ষা সমাজের অভিজ্ঞতা থেকে এসেছিল যে, মেয়ে বড় হয়ে গেলে বাবার পাশে মেয়েকে শুতে দেওয়া হত না। কারণ, প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। যে কথা বাবা চিন্তাও করতে পারে না, মেয়ে দুঃস্বপ্নেও চিন্তা করতে পারে না, রাত্রি যত গড়াতে থাকে হঠাৎ তাদের মনের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। তাদের নিজেদের মধ্যে যে প্রাকৃতিক শক্তি ও ক্ষমতা আছে সেগুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বাবা মেয়ে কেউই কোনও দিন যা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি, রাত্রিবেলা তাই ঘটে যায়! ঘটে যাবার পর একজন আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হচ্ছে, আর একজন বিক্ষোভে ফুটছে। খুব বড় মানুষ না হলে, রুচি-সংস্কৃতির একটা বিরাট মান না থাকলে এ জিনিস ঘটতে পারে। একজন বিপ্লবী হলেও এই বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। নাহলে এইভাবে বিপত্তি ঘটতে পারে। আর এখন কী হয়েছে? না, এগুলো সব কুসংস্কার, এসব কিছু নয়, এগুলোতে কিছু আসে যায় না, এইসব বলে ছেলেমেয়েরা মেলামেশা করে ঠিকই, মেলামেশায় কিছু অসুবিধাও নাই। কিন্তু মেলামেশার জন্য উন্নত যে সংস্কৃতিগত, রুচিগত শিক্ষা-দীক্ষা এবং চরিত্রগত, ব্যক্তিত্বগত ভিত থাকা প্রয়োজন, সেইসব ভিত তৈরি হল না। আর এই ভিত তৈরি না হলে কী হয়? ভাই বোনকে নষ্ট করছে। খুড়তুতো ভাই-বোন, জ্যেঠতুতো ভাই-বোন মেলামেশা করছে, মামা-ভাগ্নী ঘুরে বেড়াচ্ছে, সিনেমা দেখছে, আর সিনেমা

দেখতে গিয়ে পাশাপাশি সীটে বসে ফিস ফাস করছে। দু'জন ছেলে এবং মেয়ে কর্মী যদি বলে, তারা দু'জন যখন কমরেড, এইসব কুসংস্কার তারা মানে না। তারা বিপ্লবী, তারা সব ফাইট করতে পারে— এই কথা বলে তারা এক ঘরে জোর করে শুয়ে পড়ে। কেউ বলতে গেলে বলে, এ তো মশাই কুসংস্কার, পার্টির ছেলেমেয়েরা একত্রে থাকবে অত কথা কী? ফলে শুলো। কিছু ভেবেও শোয়নি, কোনও কুচিন্তা নিয়েও শোয়নি। কিন্তু যখন রাত্রি গভীর হতে থাকল, ছেলে মেয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে, কেউই ঘুমোয়নি, খুসখুস, খুসখুস করছে। ওর গায়ে একটু আঙুল লাগছে, সে একটু সরে যাচ্ছে। এই করছে। তারপর যেই কাণ্ডটি ঘটে গেল, তখন বিবেকে লাগছে। ভাল ছেলে, ভাল মেয়ে, তারা তো খারাপ নয়। তৎক্ষণাৎ তারা বলে, না কমরেড, একজন আর একজনের সম্বন্ধে এরকম একটা আবেগ আগাগোড়াই ছিল, এই বলে নিজেদের আচরণের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করার তত্ত্ব আওড়াতে থাকল। দু'জনেরই পরস্পরের প্রতি আবেগ আছে, সেইজন্য এটা ঘটেছে— এই হল তার পরের ব্যাখ্যা। অথবা একজন আর একজনকে তিরস্কার করে বলল, এইরকম ঘটনা আর যেন না ঘটে।

সাধারণ মানুষ এইসব ঘটনাকে যেভাবেই দেখুক, দলের কর্মীরা এইভাবে দেখবেন না। আবার এই নিয়ে এত তুলকালাম কাণ্ড করবেন না। পারলে, একে অপরকে সাহায্য করুন, এইসব আচার এবং ঢিলেমি থেকে একে অপরকে রক্ষা করুন। বলুন, এরকম করা উচিত নয়। গায়ের জোরে এরকম করা ঠিক নয়। এতে কী হবে, কী হবে, করা ঠিক না। এর আগে এ ব্যাপারে অনেক বীর দেখা গেছে। এরকম করলে পরে বিপর্যস্ত হবে, তখন মুখ দেখাতে পারবে না। অথবা একজন যাকে চায় না, তার সাথে সে জড়িয়ে পড়বে। এ নিয়ে কত কাণ্ডই না ঘটে। একটি ছেলে কোনওদিনই যে-মেয়েকে ভালবাসতে চায়নি, যেহেতু এরকম একটা কাণ্ড ঘটেছে, তার ফলে তার দায়িত্ব নিতে হয়। যেহেতু ভাল ছেলে সেহেতু তাকে বলতেই হয়, মেয়েটির সঙ্গে তার ভালবাসার সম্পর্ক আছে। নাহলে মেয়েটি বলবে, ছেলেটি এরকম করল কেন? তখন বলতে হয়, ঠিক আছে, তাহলে সে তাকে বিয়ে করবে। অথচ তাকে সে চায়নি, তাকে ভালবাসতে চায়নি। একটি মেয়ের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। ফলে, তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রকম কত বিপত্তি ঘটে।

মনে রাখতে হবে, বিশ্বজুড়ে প্রাণীজগতে যৌনক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলছে। গোটা মানবসমাজও ভিন্নভাবে একই নিয়মে চলছে। যাঁদের বড় মানুষ বলে গণ্য করা হয়, তাঁদের জীবনেও সেক্স সংক্রান্ত নানা সমস্যা ঘটতে পারে। তাহলে কী দেখতে হবে? দেখতে হবে, মানুষটা বড় কি না, মানুষটার আর

পাঁচটা গুণ আছে কি না। তারপরে দেখতে হবে, সেগুলো কীভাবে রক্ষা করতে পারেন। যদি কোনও ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন, খুব ভাল। কিন্তু যদি কেউ এই প্রাকৃতিক শক্তির আক্রমণের শিকার হন, দুর্বলতার শিকার হন এবং নিজেকে রক্ষা করতে না পারেন, তার প্রতি এত মারমুখী হতে হবে কেন? বরং তাকে কীভাবে সাহায্য করা যায়, তা দেখা দরকার। শুধু এইটুকু দেখা দরকার যে, সে সাহায্য নিতে চায় কি না, সে বিপ্লবী হতে চায় কি না, সে বিপ্লবের জন্য সাধনা করছে কি না, চেষ্টা করছে কি না। নাকি সে শুধু সুবিধা নেওয়ার সময় আছে, তালে আছে এই আধুনিক তত্ত্বগুলোকে, বিপ্লবের তত্ত্বগুলোকে তার সুবিধার কাজে কী ভাবে লাগানো যায়। তখন তার সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। দরকার হলে তাকে পার্টি থেকে বের করে দিতে হবে। কিন্তু একজন ভাল কমরেড, এরকম সে চায়নি, ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছে এবং তার থেকে সে বেরোতে চাইছে, কিন্তু একা একা পারছে না— তাকে সকলে মিলে তখন সাহায্য করতে হবে। সাধারণ মানুষ যদি এ ব্যাপারে সমালোচনা করে, তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, সমস্যাটা কোথায়? তাদের বলতে হবে, শুধু এইটুকু না দেখতে। বলতে হবে, সাধারণ মানুষের ঘরেও তো এ ধরনের কত কিছু ঘটছে, কিন্তু উনি কি তা করেছেন? উনি একটা বিপাকে পড়েছেন, একটা সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছেন এবং জড়িয়ে গিয়ে সেই দায়িত্ব স্বীকারও করেছেন। খুব বড় ক্ষমতাবান মানুষ না হলে এরকম যে কোনও অবস্থায় যে কেউ এ ধরনের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু উনি তাকে স্বীকার করেছেন, তাকে সঙ্গীরূপে গ্রহণ করেছেন। জনসাধারণের জন্য তিনি অনেক কিছু ত্যাগ করতে রাজি। ভালবেসে বা বিয়ে করে তিনি ঘর-সংসার করছেন, অন্যদের ঠকাবার কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই। আর অন্য জায়গায়, যে অনেকের ঘরের বউদের সর্বনাশ করছে, ছেলের বউয়ের সর্বনাশ করছে, মামা ভাগ্নীর সর্বনাশ করছে, জামাইবাবু শালির সর্বনাশ করছে— তাদের কী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেন? মনে রাখবেন, এটা একটা অত্যন্ত ক্ষমতাবান প্রাকৃতিক শক্তি। এই প্রাকৃতিক শক্তির আক্রমণ পৃথিবীর অনেক বড় মানুষকেও সহ্য করতে হয়েছে। অনেক বড় মানুষ নীলকণ্ঠের মতো নিজে এই বিষকে গলায় ধারণ করে মানুষের জন্য অমৃত উদগীরণ করে দিয়েছেন। কিন্তু সবসময় কি প্রকৃতির এই আক্রমণ থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে? খুব কম মানুষ পেরেছেন। যাঁরা পেরেছেন, তাঁরা সত্যিকারের অর্থে বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ক্ষমতাবান বড় মানুষ।

এখন আমি যে বিষয়টা বলতে চাই, তা হচ্ছে, একজন বলে গেলেন, আমরা সেক্সকে পরিত্যাগ করতে পারি কি না। না, সেক্সকে কেউ পরিত্যাগ

করতে পারে না। কেউ তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে এইমাত্র। একে গ্রহণের যেমন সমস্যা অনেক, পরিত্যাগের সমস্যাও অনেক। আসল বিষয় হচ্ছে, জীবনে সেক্সের যথার্থ প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। উৎপাদনের বিকাশের একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরে মানুষের চরিত্রের বিকাশে, সভ্যতার বিকাশে, ব্যক্তির উন্নতি ও বিকাশের ধারায় সেক্সের ভূমিকা কী, সেইটিকে অনুধাবন করে, সেই অনুযায়ী আদর্শের সঙ্গে, প্রগতিশীল আন্দোলন এবং রুচির সঙ্গে সেক্সকে যদি আমরা একটা সুরে বাঁধতে (tune করতে) পারি, তবেই আমরা যৌন দাসত্বের থেকে মুক্তি অর্জনের সংগ্রামের আন্দোলনে পদক্ষেপ করলাম এবং এই পথে আমরা একদিন যৌন দাসত্ব থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারব। কাজেই বর্জন বা গ্রহণ নয়, আমি সেক্স বর্জন করেছি, এ কথা বলে দুনিয়াকে ঠকাচ্ছি, নিজেকে ঠকাচ্ছি, ঠকাচ্ছি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে (subtle wayতে)। সেইজন্য প্রয়োজন অত্যন্ত দুরূহ এই সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করা। সাধারণ মানুষ সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে, ধর্মীয় পুরনো ধারণার রেশ থেকে একজন মানুষের সমস্ত অপকর্মের দায়দায়িত্ব, চরিত্রের দোষাবলি, এই সবকিছুর থেকে বেশি মূল্য দেয় সেক্সের সম্বন্ধে ধারণার উনিশ-বিশ করে। অর্থাৎ, একটা মানুষের অন্য জিনিসগুলি গৌণ করে শুধু সেক্সকে ভিত্তি করে চরিত্রের ভাল-মন্দ বিচার হয়ে যায়। সেক্স সংক্রান্ত বা যৌনজীবন সংক্রান্ত ব্যাপারে এতটুকু বিচ্যুতি হলে মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এই জায়গাটাতে এখনও সমাজের মানসিকতার তেমন পরিবর্তন হয়নি। বিশেষ করে এ ব্যাপারে মানুষের মধ্যে পুরনো নীতি-নৈতিকতার অবশেষ কিছুটা কাজ করছে, সংস্কারে রয়েছে এই ধারণাগুলি। ফলে যারা সেক্স সম্পর্কে নির্বিকার ভাব দেখায় বা বাস্তবিকই হয়ত সেক্সকে ঘৃণা করে, মানুষ সঙ্গে সঙ্গে তার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ইনি একেবারে মহামানব, ব্রহ্মার পুত্র বা স্বয়ং ব্রহ্মা। অথচ এরা সাধারণত হীন প্রকৃতির (sneaky), অত্যন্ত স্বার্থপর ও বিকৃত রুচির মানুষ হয়। তবে এমন হতে পারে যে, সেক্স বর্জনের মতো ভুল চিন্তা নিয়ে না চলা সত্ত্বেও একজন বিপ্লবীর জীবনে ভালবাসার সম্পর্ক এলই না, তাই তিনি বিয়ে করলেন না। কিন্তু নিরন্তর বিপ্লবী সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় বিপ্লবী সহকর্মী ও জনগণের সাথে অপার ভালবাসার সম্পর্কে তাঁর হৃদয় সবসময় পূর্ণ থাকে।

এখন এই বিপ্লবের সংগ্রামের সাথে আমাদের দেশের বহু যুবক-যুবতী যুক্ত হচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমান পিতৃপ্রধান সমাজ থেকে মেয়েরা রাজনীতিতে আসছে। যদিও সরাসরি বিপ্লবের জন্য আসছে, বা বিপ্লবী হচ্ছে— এই সংখ্যাটা কম। এদের মধ্যে যারা উন্নত মানের তারা কেউ ভালবাসল কি বাসল না বা জীবনে সেক্স এল কি এল না, তার সাথে বিপ্লবী হওয়ার প্রশ্নটাকে মেলায়নি।

অর্থাৎ, সর্বহারা বিপ্লবের জন্য দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন হচ্ছে, তারা মনে করেনি, তার সাথে ভালবাসাটা জড়িয়ে মিলিয়ে আছে। অর্থাৎ, এদের কাছে বিপ্লবী আন্দোলনে থাকার মানে এটা নয় যে, ভালবাসাটা আছে তাই বিপ্লবটা আছে এবং দলটাও আছে, বা ভালবাসাটা যদি না থাকে, তাহলে দলটাও থাকল না। এইভাবে ভালবাসার সাথে তারা দলটাকে মেলায়নি। আমি সেদিন এই কথাটা আলোচনা করেছিলাম কি না জানি না। এই কথাগুলোর দ্বারা আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, তা হচ্ছে, বিপ্লবের জন্য লড়াইটাই মুখ্য। এই মুখ্য লড়াইতে যারা আত্মনিয়োগ করল, তারা যথার্থ সেক্সের প্রকৃতি বুঝতে সক্ষম হবে। আবার যেহেতু সেক্সের প্রয়োজন আছে— এই ধারণাকে আরেক দল এইরকম ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে, সে বিপ্লবের সঙ্গে আছে এবং বিপ্লবের সঙ্গে সে ভালবাসাকে জড়িয়ে চলবে। না, এটা ঠিক নয়। এখানে ভালবাসা মেকি, সে সত্যি ভালবাসে না। এর ফলে সত্যিকারের একটা ভালবাসা কমিউনিস্টদের জীবনে কী হতে পারে তার আস্বাদন সে কোনও দিনই পেতে পারে না। সে তখনই সেই আস্বাদন জীবনে উপভোগ করতে পারে, যখন সে বুঝেছে, সে বিপ্লবী, এইটাই মূল কথা। সে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলছে, তার মধ্যে তার ভালবাসা এসেছে, তাকে আরও সুন্দর করার একটা উপাদান হিসেবে সে তাকে নিয়েছে। তাই সে ভালবাসা সবসময় মহৎ ও সুন্দর। কারণ জনগণের প্রতি তার ভালবাসা ও মমত্ববোধ, যার থেকে চরিত্রের সমস্ত ঔদার্য মানুষ আহরণ করে, বিরাটত্ব আহরণ করে, রস আহরণ করে, জ্ঞান আহরণ করে, তাই সৌন্দর্যে প্রতিভাত হয়ে নরনারীর মধ্যে ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। ফলে তা হয় সুন্দর।

কিন্তু যে বিপ্লবী নয়, সে তো ভালবাসার সেই স্বাদ পেল না, যেটা নৈর্ব্যক্তিক, যেটা জনগণের প্রতি তার ভালবাসা এবং দরদবোধ ও রসবোধ থেকে সৃষ্ট। সর্বশ্রেষ্ঠ এই যে রস, তার সন্ধান সে পায়নি। শুধুমাত্র একজনের প্রতি ভালবাসা, সেটা দিতে পারে না। ফলে সেখানে ভালবাসার অর্থ দাঁড়ায়, গড়পড়তা সাধারণ মানুষ ভালবাসা বলতে যা বোঝে তাই। অর্থাৎ, আসলে যা যৌন আকর্ষণ, তার সাথে মন দেওয়া-নেওয়া ও তার সাথে কিছু মান-অভিমান, এইমাত্র। দুটো রুচির প্রলেপ লাগানো, দুটো কাব্য-সাহিত্য করাকেই একদল ভালবাসা হিসাবে চালাচ্ছে এবং চলছেও। আজও সভ্য সমাজের মধ্যে ভালবাসা গড়পড়তা এই জায়গায় এসে থমকে আছে। আবারও বলছি, মানুষের যখন জল খাওয়ার প্রবল প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে কি নর্দমার জল খাবে? নাকি পরিষ্কার, বিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন জল খাবে? প্রবল তৃষ্ণা পেয়েছে বলে মানুষ যেমন ইচ্ছা তেমন জল খেতে পারে না। আমরা সকলেই বিপ্লবী রাজনীতির সৈনিক, সেইজন্য একথা ভাবা

কোনওক্রমেই ঠিক হবে না যে, আমরা সেক্স নিয়ে যেরকম ইচ্ছা সেরকম আচরণ করতে পারি, যেন এতে কিছু যায় আসে না। মানবতাবাদ আসার পর থেকেই সেক্স সম্পর্কে পুরনো ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা পাল্টে গেছে, ধর্মীয় সংস্কার থেকে বা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা মুক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে খানিকটা মুক্ত উদার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে। অর্থাৎ, যে ধারণা মানবতাবাদীরা মানুষের মধ্যে এনেছিলেন তাহল, সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে সেক্সের ভাল-মন্দ বলে কিছু নেই। এর ভাল-মন্দটা তার আয়ত্তের মধ্যে এবং এটাই একমাত্র তার ধর্ম নয়। অর্থাৎ তার সমস্ত জীবনটা দেখতে হবে। দেখতে হবে, তার সমস্ত জীবনটাতে ভাল দিকটা প্রতিফলিত হচ্ছে কি না। সেক্স বিষয় (abstract) হিসাবে কিছু খারাপ নয়। তার পরিণতি কি, সেইটা ঠিক করবে তা ভাল কি খারাপ।

মানবতাবাদ যে বৃহত্তর আবেদন নিয়ে এল, সাধারণভাবে গোটা সমাজের সামনে তার একটা প্রভাব পড়ল। কেউ কেউ বলতে লাগল যে, সেক্সের মধ্যে ভাল-মন্দের কিছু নেই। ভালমন্দটা হল তার আদর্শ, তার ধর্ম। সমস্ত জীবনের মধ্যেই সেটা প্রতিফলিত হবে। সেই অর্থে সেক্স মানেই খারাপ কিছু নয়। তার পরিণতিটা ভাল কি মন্দ, তা দিয়ে তার বিচার করতে হবে। আবার একথা আপনাদের বুঝতে হবে যে, সেক্সকে আমরা কেউ পরিত্যাগ করতে পারি না। পরিত্যাগ করারও অনেক সমস্যা আছে, আবার গ্রহণ করারও সমস্যা আছে। মূল প্রশ্ন হচ্ছে, জীবনে সেক্সের যথার্থ প্রয়োজনকে উপলব্ধি করা। মানুষের চরিত্রের বিকাশে, উন্নতির ক্ষেত্রে সেক্সের ভূমিকা কী, সেটা আমাদের বুঝতে হবে। একটা বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরের পরিপ্রেক্ষিতেই সেটা বুঝতে হবে— অর্থাৎ, প্রচলিত বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সেটা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, আদর্শের সাথে মিলিয়েই যৌন দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি অর্জনের যে সংগ্রাম, নিজের জীবনে সেই সংগ্রাম একজন করতে পারছে কি না, সে সম্বন্ধে তার রুচিসম্মত উপলব্ধি গড়ে উঠছে কি না। এইভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করলে ভবিষ্যতে সাম্যবাদী সমাজে মানুষ এর হাত থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারবে। এইসব সমস্যা ঠিক ঠিক বুঝতে না পারলেই দেখবেন যে, সেক্স আপনাকে ঠকাচ্ছে, অপরকেও ঠকাচ্ছে। কিন্তু ঠকাচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। এর চরিত্র বোঝা খুবই কঠিন, সেই কারণে এর বিরুদ্ধে লড়াই করাটাও অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে সাধারণ কর্মী বা সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা আরও বেশি কঠিন।

অর্থাৎ সেক্স সংক্রান্ত আচরণে একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেই মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তখন তার ভালমন্দ গুলিয়ে যায়। ফলে যে সমাজে একটা নৈতিকতা কাজ করছে, ভালমন্দ বোধ কাজ করছে এবং একটা সংস্কার কাজ করছে, সেখানে

ব্যক্তি মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। আবার, যারা সেক্স সম্পর্কে নির্বিকার ভাব দেখায়, তারা বাস্তবেই হয়তো সেক্সকে ঘৃণা করে। এরা সাধারণত সবচেয়ে হীন (sneaky) প্রকৃতির এবং সবচেয়ে বিকৃত রুচির হয়। এরা যা কিছু করে, সেটা লোকচক্ষুর অন্তরালে করে। এতে তাদেরই ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। তারা তাদের আচরণকে যতই যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলে ধরুক না কেন, এতে বাস্তবকে উপেক্ষা করা চলে না। তাছাড়া এরা হয় অত্যন্ত সংকীর্ণমনা, আবার তারা এক এক সময় যৌন অবসাদে ভোগে। একসময় যৌনতা নিয়ে সে যে বাড়াবাড়ি করল, তারপরেই এর উল্টো প্রতিক্রিয়ায় তার মধ্যে এ ব্যাপারে অবসাদের জন্ম হয়। মানুষের জীবনে সেক্সের যথার্থ ভূমিকা ও প্রয়োজনকে না বুঝলেই এইসব বিপত্তি সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এইগুলো ঘটে সেক্স সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। এর প্রভাব নানা জায়গায় বর্তায়। চিন্তার ক্ষেত্রে, দর্শনের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে বা বিবেক-বুদ্ধির ক্ষেত্রে তার প্রভাব বর্তায়। কিন্তু তার ফল ভোগ করে জনসাধারণ। এটা বাস্তব সত্য।

আমি যে আপনাদের সামনে এই আলোচনা করছি, এটা কী জন্য করছি? এসব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কী দরকার ছিল? একথা বুঝতে হবে যে, কর্মীরা, অর্থাৎ দলের ছেলেমেয়েরা বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের এই সমস্যার সমাধানে আমি বিপ্লবের প্রয়োজনেই সাহায্য করতে পারি কি না সেই প্রয়োজনেই এই আলোচনা করছি। একথাও সত্য যে, বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত আছে, হতে পারে এমন কোনও কর্মীর জীবনে ভালবাসার সম্পর্ক বা বিশেষ করে যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এই কথার দ্বারা আমি বলতে চাইছি যে, বিপ্লবটাই আমাদের কাছে মুখ্য। এই মুখ্য লড়াইয়ের জন্য যারা আত্মনিয়োগ করল, তারাই সেক্সের যথার্থ প্রকৃতি বুঝতে পারল, ভালবাসার সত্য রূপ তাদের সামনেই প্রতিভাত হল। রুচির সাহায্যেই এটা ঘটতে পারে। সত্যিকারের ভালবাসা নিছক দু'দিনের আনন্দভোগ করার জন্য নয়— যদিও মানবতাবাদীরা একসময়ে ভালবাসা ও যৌন আকর্ষণকে আলাদা করে দেখতেন। কারণ বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তাঁরা সেক্সের স্বরূপ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝতে পারেননি। মানবতাবাদীদের মধ্যে যাঁরা বিদগ্ধ বলে পরিচিত, তাঁদের মধ্যে এই ধারণাটাই বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। এমনকী কমিউনিস্টদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন, যাঁরাও মনে করেন যে, ভালবাসা ও সেক্সটা এক নয়। মানুষের জীবনে তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সেক্সের ভূমিকা কী— সেটা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। খুব আদর্শবাদী লোকের জীবনেও দেখা গেছে যে, সেক্স তাঁদের জীবনে প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এটা ঘটছে কেন, সেই উত্তর তাঁরা

দিতে পারেননি। এ জিনিস অনেক বড় মানুষের ক্ষেত্রেও হয়েছে। এরকম ঘটছে কেন, এর উত্তর দিতে গিয়েই আমরা দেখতে পেলাম যে, উৎপাদন ব্যবস্থার একটা বিশেষ স্তরে ভালবাসার সঙ্গে মিশে তার যৌন আচরণের ধাঁচাটি গড়ে উঠেছে, এটা তারই প্রতিফলন। আবার অনেক সময় দেখা গেছে, এমনকী কোনও কোনও বড় মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, সত্যিকারের ভালবাসার পাত্রপাত্রী ছাড়াই তাঁদের জীবনে সেক্স এসেছে। অবশ্য, তাঁরা তাকে তাঁদের রুচি দিয়ে যতটা সম্ভব উন্নত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের মনে ধাক্কা দিয়েছে যে, তাঁরা অরুচিকর কুরুচিকর কোনও কিছু করতে চাননি। তবু যেখানে ভালবাসছে, শুধু সেখানে সেক্স আসছে তাই নয়, সেক্স অন্য জায়গায় এসে দেখা দেয়। কেন দেখা দেয়? রুচির দিক থেকে যাঁরা সত্যিকারের বড় মানুষ, যাঁদের তদানীন্তন পরিবেশে হীনমন্যতা ছিল না, তাঁদের ক্ষেত্রেও কেন এরকম ঘটে— এর সঠিক উত্তর তাঁরা খুঁজে পাননি। সুতরাং তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, সেক্স স্বাধীন। তাহলে তাঁদের কাছে সমস্যা কী? তাঁদের কাছে সমস্যা হচ্ছে, তখন ন্যায়নীতি দিয়ে এই সম্পর্কটাকে গ্রহণযোগ্য কর। যৌন সম্পর্ক যদি আসে, সেটাকে অরুচিকর করো না, অপরের সর্বনাশ করো না, যাকে জড়ালে তার দায়দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা যেন থাকে। তার জীবনে কালিমা লেপে দিয়ো না, কালিমা এলে নিজে গায়ে মাখো, তার গায়ে যেন না লাগে। এইসব রুচি ও মূল্যবোধগুলোকে তাঁরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে সমস্যাকে তাঁরা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তবু তাঁদের মনে ধাক্কা দিয়েছে যে, তাঁরা অরুচিকর, কুরুচিকর কিছু করতে চাননি তবুও এমন ঘটনা ঘটল কেন? তাঁরা নীচ প্রবৃত্তির মানুষ ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সেক্স হচ্ছে স্বাধীন। তাহলে সমস্যাটা কী? বুঝতে হবে, যৌন সম্পর্ক যেখানেই আছে সেখানেই অরুচিকর কিছু আছে, এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। এখানে রুচির প্রশ্নটি খুবই জরুরি। এইসব রুচি ও মূল্যবোধের বিষয়গুলো খুব ভাল করে বুঝতে হবে। যাই হোক, আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, সেটা হল, বিষয়টা এরকম নয় যে, আমরা সেক্সকে পরিত্যাগ করতে পারি কি না। সাধু-সন্ন্যাসীরাও মুখে যতই বলুক না কেন, তারাও সেক্সকে পরিত্যাগ করতে পারে না। আসলে তারা এইসব কথা বলে মানুষকেই ঠকায়।

সবসময় মনে রাখতে হবে, সেক্সের প্রকাশের চিরস্থায়ী কোনও রূপ নেই, চাহিদা নেই, ঝোঁক নেই, আবেগ (impulse) নেই, চরিত্র নেই। প্রতিমুহূর্তে মানুষের ভাব ও সংস্কৃতিগত জীবন তার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে সেক্সের আবেগগত, চরিত্রগত, প্রবৃত্তিগত চরিত্র পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। সেটা একরকম থাকছে না। আর সেখানেই মার্কসবাদী ও বিপ্লবীদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে বুঝতে হবে,

কী ভাবে তা পাল্টে যাচ্ছে এবং এই পাল্টে যাওয়ার প্রক্রিয়ার সাথে জীবনের অগ্রগতির প্রক্রিয়ার যোগ বা সামঞ্জস্য কতটা? যদি থাকে, তাহলে সেটা কী ধরনের? অর্থাৎ, উৎপাদনের বিকাশের পথে সংস্কৃতিগত আন্দোলনের বিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সেক্সের আবেগগুলোর এই পরিবর্তন এবং সেক্সের বিশেষ বিশেষ ধরনের আবেগ থেকে মানুষের মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম কী ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, সেক্স কী ভাবে নিজে প্রভাবিত হচ্ছে, কী ভাবে তার চরিত্র পাল্টাচ্ছে, এইটা বুঝতে হবে। একটা বিশেষ যে অবস্থায় আমরা সংগ্রাম করছি, সেই বিশেষ অবস্থাটাকে বুঝতে হবে। এই অবস্থা বলতে একটা সমাজ পরিবেশকে বোঝাচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও উৎপাদনের বিকাশের স্তরকে বোঝাচ্ছে। যেমন বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নৈতিকতার মান, আদর্শের মান, মূল্যবোধ, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কোন জায়গায় আছে এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে কী পরিস্থিতিতে মানুষ অবস্থান করছে, বিপ্লবী আন্দোলন অবস্থান করছে ইত্যাদি বুঝে ঠিক সেই অবস্থানে সমস্ত মানুষের মুক্তি সংগ্রাম ও বিকাশের ধারার সাথে সেক্সের দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রাম কেমন ভাবে মিশে আছে এবং সেক্সের প্রকৃতিটি কী, মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে তার বিরোধের প্রকৃতি কেমন এবং কেন, কোথায় মিলনের প্রকৃতি এবং কী ভাবে— এসব বুঝতে হবে। এই সেক্সকে আদর্শের সঙ্গে, রুচির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে টিউন করতে পারলে সেক্স মুক্তি সংগ্রামের পরিপূরক হতে পারে। সেক্স এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে এইটাই গবেষণার বিষয়। তাহলে দেখছেন, ভালবাসা হচ্ছে একজন বিপ্লবীর পক্ষে এমন একটা ক্ষেত্র, যদি তা জনগণের প্রতি ভালবাসার প্রতিফলন না হয়, সমাজের প্রতি অধিকতর দায়িত্ববোধের প্রতিফলন না হয়, অর্থাৎ বিপ্লবীদের ভালবাসা যদি জনগণ, বিপ্লব এবং দলের প্রতি কর্তব্যবোধ, সীমাহীন ভালবাসা, মমতা ও দরদের একটা সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি না হয়, তাহলে একটা বিশেষ ক্ষেত্রে এই ভালবাসা একান্ত না হয়ে পারে না, যা বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে থেকে সবসময় বিপ্লবের ক্ষতি করে এবং বিপ্লবী চরিত্রগুলিকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খেয়ে নেয়।

মানুষের ক্ষেত্রে যৌনতার আবেগটি হচ্ছে শুধু যৌনতা সম্পর্কিত মানসিক আবেগ, এইরকম ভাবে বুঝলে ভুল হবে। আবার উৎপাদন ব্যবস্থা পাল্টে যাচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেক্সের ধারণা ও প্রকৃতি পাল্টে যাচ্ছে, ব্যাপারটা এরকমও নয়। মোটা অর্থে এইরকম করে ভাবলে যান্ত্রিকভাবে ভাবা হবে। কারণ উৎপাদন ব্যবস্থা পাল্টে গেলে নতুন একটা বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে আদর্শগত ক্ষেত্রে একটা নতুন ভাবগত জগত গড়ে ওঠে, একথার মানে এই নয় যে, অতীতের উপরিকাঠামো বা ভাবজগতের সমস্ত অবশেষ আপনা

আপনি চলে যায়। না। সে থেকে যায় এবং সব ক্ষেত্রে সে ক্রিয়া করে। বিশেষ করে সেক্সের ক্ষেত্রে আরও বেশি ক্রিয়া করে বলে আমার ধারণা। পুরনো ঐতিহ্যের অবশেষ, আদর্শগত ধারণা এবং অতীতের প্রভাব নিয়েই, একটা নতুন সমাজ পরিবেশে, একটা নতুন ভাবাদর্শের আমরা অধিকারী হলাম। এর মানে হল, সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ঐতিহ্য, বিশেষ করে সেক্সের ধরন-ধারণ, আবেগ, চরিত্র একেবারে নতুন ধরনের হয়ে গেছে, এইরকমের ধারণা অত্যন্ত যান্ত্রিক ধারণা। উপরিকাঠামোর পরিবর্তনের ধারণাটা এরকম যান্ত্রিক নয়। আর সেক্সের ক্ষেত্রে তো নয়ই। এই কথাটা মনে রাখতে হবে।

মানুষের ভাবনা ও সংস্কৃতি, যেটা জীবনের সাথে মিশে গেছে, সেটা তার প্রবৃত্তিই শুধু নয়, সেক্সের চরিত্রকেও প্রতিমুহূর্তে পাল্টে দিচ্ছে। সেটা সবসময় একরকম থাকে না। এটা মার্কসবাদী ও বিপ্লবীদের ভাল করে বুঝতে হবে। বিচার করে দেখতে হবে, এই পরিবর্তন জীবনের গুণগত মানের উন্নতির ক্ষেত্রে, অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাহায্য করছে, কি করছে না। উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে তার ভাবগত উৎপাদন মানুষের মুক্তি অর্জনের সংগ্রামে কী ভাবে সাহায্য করছে, তা ভাল করে বুঝতে হবে। এটা যদি আমরা ভাল করে বুঝতে না পারি, তাহলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। বিচার করে দেখতে হবে যে, আজকের এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় যেখানে চূড়ান্ত নৈতিকতার সংকট ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, আদর্শ ও মূল্যবোধের সংকট দেখা দিয়েছে, সেখানে শোষিত মানুষের সংগ্রামকে কী ভাবে যৌনজীবন সাহায্য করতে পারে, যাতে সেটা মুক্তি সংগ্রামের পরিপূরক হতে পারে। এটাই হচ্ছে ভালবাসা ও যৌনতার সম্পর্ককে বিচার করার সঠিক মাপকাঠি। এটা না বুঝলেই যৌনজীবনে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। ভালবাসা যদি জনগণ এবং বিপ্লবের প্রতি ভালবাসার দায়িত্ববোধ থেকে উদ্ভূত এবং সঞ্চারিত না হয়, তাহলেই সমস্যা দেখা দেয়। যদি ব্যক্তিজীবনের ভালবাসা, জনগণের প্রতি ভালবাসার বিশেষীকৃত রূপ না হয়, তাহলেই সমস্যা দেখা দেয়। তখন সেটা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতি করে, একজন বিপ্লবীর চরিত্রকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খেয়ে নেয়। আমি এই কথাটাই আগেই আপনাদের বোঝাতে চেয়েছি।

আমি আগেই বলেছি যে, মানুষ এবং জন্তুর মধ্যে মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে। মানুষ চিন্তা করার অধিকারী, মানুষ ছাড়া অন্য কোনও জন্তুই চিন্তা করার অধিকারী নয়। উৎপাদন করার প্রয়োজনেই মানুষ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়াতেই সমাজে একদিন বস্তুগত ও ভাবগত উৎপাদন গড়ে উঠল। ফলে মানুষের মধ্যে যৌনতা আর পশুর স্তরে রইল না, সেটা ধীরে ধীরে পাল্টাতে

শুরু করল। অন্যান্য জীবজন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, কিন্তু মানুষ অন্ধভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বশীভূত থাকতে চাইল না। তাই মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর যৌনক্রিয়াও একরকম নয়, যদিও একেবারে গোড়ার দিকে মানুষের আচরণ অনেকটা জন্তুর মতোই ছিল।

এদিকে সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন দেখা দিল। চাষবাস এসে গেল, শ্রমের প্রকৃতি কিছুটা উন্নত হল। কালক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হল। সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হল। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে গেল, মেয়েরা ছেলেদের দাসে পরিণত হল। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে যে ধরনের ফ্রি-সেক্স প্রচলিত ছিল— সেটা পরিবর্তিত হতে লাগল। সেখানে কিছুটা সামাজিক বাধানিষেধ কাজ করতে শুরু করল। প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বেঁচে থাকার স্বার্থেই, উৎপাদনের স্বার্থেই তাদের আগের চেয়ে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ হতে হল। এই ঐক্যের প্রয়োজনে শৃঙ্খলা দৃঢ় করার জন্য কিছু বাধা-নিষেধ প্রবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিল। তদানীন্তন সময়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সুবিধা এবং শোষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ন্যায়-নীতির ধারণাগুলি গড়ে উঠতে থাকল এবং এই ন্যায়-নীতির দ্বারা অভ্যস্ত হওয়ার ফলে যে রুচিগত মান মানুষের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকল, সেই রুচিগুলো সেক্সের ধরন-ধারণ পাল্টে দিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তাই ধর্মকে ব্যবহার করে সতীত্বের ধারণা গড়ে উঠল। অতীতে আদিম সমাজে সেক্সের ক্ষেত্রে নারীদের যে উদ্যোগ ও সক্রিয় ভূমিকা ছিল, সেটা কিছুটা হলেও থিতিয়ে গেল। তবে এটা মনে করলে ভুল হবে যে, সেই উদ্যোগ পুরোটাই থিতিয়ে গেল। অনেকটা যেন তা অন্তর্মুখী হয়ে পড়ল। নিজে থেকে উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা কিছুটা পিছিয়ে পড়ল। এইসময় থেকে দেখতে পাওয়া গেছে যে, পুরুষরাই যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রে বেশি উদ্যোগ নিতে শুরু করল। অন্যদিকে জন্তু-জানোয়ার সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। যৌন আবেগ ক্রিয়া করবার রীতি এক একটা প্রজাতির এক এক রকমের। প্রাণীজগতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর (periodical) সেক্স প্রধান ভূমিকা পালন করে, এটা করে যৌন আবেগ আনার ক্ষেত্রে। মানুষের জগতে গোড়ার দিকে এইটাই প্রধান ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজে। তারপর মাতৃতান্ত্রিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এসে দেখছি, মানুষের ক্ষেত্রে যৌন আবেগের উদ্যোগটা বদলে গেছে এবং এটা আগের মতো নির্দিষ্ট সময় অন্তরের উপরে আর নেই। পরবর্তীকালে, নারীদের অধিকার বিকাশের সময়ে ভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা তার কিছু কিছু পরিবর্তন দেখছি। কিন্তু গোড়ার যুগে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আসার পর পুরো অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ ধরে কিছু ব্যতিক্রম

থাকলেও, নারীদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা এইরকমেরই ছিল। এই কারণে দেখা যাবে, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রের বিরাট অংশ জুড়ে আছে, নারী-পুরুষকে যৌনজীবনে কী ভাবে সুখী করা যায় তার আলোচনা। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীরা সুখী হত না। কারণ যৌন সহবাসের আনন্দ পাওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে প্রয়োজনীয় উত্তেজনা তাদের মধ্যে সহজে সৃষ্টি হয় না। ছেলেরা যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করে গা-হাত-পা ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার ফলে মেয়েদের অনেক বিপত্তি সৃষ্টি হয়। তাই বাৎস্যায়নের শাস্ত্র এইসব বিষয়ে চর্চা করেছে। চর্চা করেছে কী ভাবে ধীরে ধীরে মেয়েদের যৌনক্রিয়ায় সম্পূর্ণ তৃপ্তির জন্য তাদের যৌন আবেগকে জাগাতে হবে, ধীরে ধীরে তাকে প্রস্তুত করে কী ভাবে উত্তেজিত করে তুলতে হবে। সেই তৃপ্তি না থাকলে তাদের মধ্যে কতকগুলো মানসিক রোগ সৃষ্টি হয়, নানারকমের উপসর্গ সৃষ্টি হয়। তখনকার দিনে এরকম কিছু কিছু জিনিস দেখা দিয়েছিল, তাই এটাকে বাৎস্যায়ন দেখালেন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল ঠিক তার উল্টো। সেখানে একটা মেয়ে একটা ছেলেকে উত্তেজিত (provoke) করে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর এখানে ছেলে মেয়েকে উত্তেজিত (rouse) করতে থাকে। আমি এটা দেখাতে চাইছি যে, অবস্থা, পরিবেশ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ফলে সেক্সের বস্তুগত দিক কী রকমের পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ধর্মীয় কুংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতায় মনে হয় সেক্স একটা নোংরামি, এ একটা অশুভ জিনিস, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অশুভ বস্তু। সভ্যতা রাখতে হবে, ধর্ম রাখতে হবে, পরিবার রাখতে হবে, সম্পত্তির অধিকার রেখে যেতে হবে, তাই বিয়ে— তাই একটা স্ত্রীর দরকার। তা না হলে স্ত্রী হল একটা ঘৃণার পাত্র, তাকে ছুঁয়ে ফেললে স্নান করতে হয়। তাই মনুর শাস্ত্র অনুযায়ী মেয়েদের প্রয়োজন কেবলমাত্র পুত্রলাভের জন্য। অর্থাৎ, স্ত্রী হল কেবলমাত্র ধর্ম রক্ষার একটা উপকরণ। শুধু একটা সন্তান দরকার, বংশ রক্ষা করা দরকার— তা না হলে স্ত্রীর কী দরকার? তাই এমন একটা সময় ছিল, এ দেশে যখন স্ত্রীরা শুধু স্বামীর পায়ে হাত দিত। পুত্রার্থের জন্য স্পর্শ করতে ঠিকই হয়, কিন্তু পায়ে হাত দিয়ে, মুখের দিকে তাকিয়ে নয়। পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত, যাতে স্বামীর করুণা পাওয়া যায়, কারণ স্বামী ঈশ্বর, স্বামী দেবতা। এতেই মেয়েরা অভ্যস্ত ছিল। ফলে সেক্সের সে উন্মাদনা তাদের মধ্যে স্তিমিত হয়েছিল, চেপে রাখা হয়েছিল সমাজের অনুশাসনে। তাদের মনের মেরুদণ্ডকে ভেঙে অভ্যাসের দ্বারা সুর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সেটা ছটফট করেছে।

আমি আগেই বলেছি যে, সেক্সের কোনও শাশ্বত রূপ নেই, চিরস্থায়ী চরিত্র

নেই। কিন্তু বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা ঠিক এইভাবে ভাবেন না। তারা মনে করেন যে, এর উপর একটা রুচির আবরণ দেওয়া দরকার— অর্থাৎ, এ নিয়ে অরুচিকর, দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ না করা। বুর্জোয়ারা রুচি বলতে যা বোঝে তাই, অর্থাৎ মানবিকতার উদার রুচি। সেক্স ক্ষণিকের জন্য যতটুকুই আনন্দ দিক না কেন, সেটা যেন রুচি বিবর্জিত না হয়। মানুষ হিসেবে, মানবতাবাদী হিসেবে, নিজের ভালর জন্য যে আনন্দ, তাতে খানিকটা ঔদার্য, মহত্ত্ব, খানিকটা স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসার প্রয়োজন আছে। ইতিহাসে এইসব ধারণাগুলো মানবতাবাদীরাই আনার চেষ্টা করেছে। তারা মনে করেছেন যে, সেক্সের চরিত্র অপরিবর্তনীয়— অর্থাৎ, শাশ্বত বা চিরন্তন। আমরা মাকর্সবাদীরা সেটা মনে করি না। আমরা মার্কসবাদীরা মনে করি না যৌন আবেগের চরিত্র শাশ্বত (absolute), স্বয়ংক্রিয় (automatic)। জন্তু-জানোয়ার যা করে তা হল পরাবর্ত ক্রিয়া (reflex action) । যেমন যেমন অবস্থা (condition) তৈরি হয়, তেমন তেমন সে গড়ে ওঠে। মানুষের ক্ষেত্রে অবস্থা হচ্ছে, তার রুচি, তার সৃজনশীল ক্ষমতা, তার আদর্শ, সংস্কৃতি, অভ্যাস, সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের দ্বারা তার সেক্সের চরিত্র পাল্টায়। এটা যখন সামগ্রিক সামাজিক আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, চিন্তা ও প্রবণতা এমন কিছু করতে বলে যা সমাজের স্বার্থ বা সমাজের বিকাশের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তখন সেই সেক্সের আবেদন থেকে মুক্ত হতে হবে। যে যৌনতাড়না মানুষের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপূরক আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়, অর্থাৎ, যে প্রবণতা এমন কিছু করতে বলে যেটা সমাজ বিকাশের স্বার্থের সাথে সংঘাতময়, সেই সংঘাতের চরিত্র হচ্ছে ক্ষতিকারক এবং সেই ধরনের যৌনসম্পর্কও ক্ষতিকারক।

জীবনে এই সেক্সের শক্তি (power) একটা মস্ত বড় শক্তি। এই শক্তির সাথে যখন আদর্শ যুক্ত হয়, তখন সেটা একটা প্রবল শক্তি। একজন তখন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, এমনকী আদর্শের জন্য সে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারে। এইভাবে যে প্রচণ্ড একটা আবেদন গড়ে ওঠে শৈশবের পর থেকে যৌবনের শেষ পর্যন্ত, সেটা জীবনের একটা সৌন্দর্য (beauty)। সুন্দর কেন? না, এই যে প্রচণ্ড একটা শক্তি যা সেক্সের শক্তিতে থাকে, সেই শক্তি যখন আদর্শ পায়, তখন প্রয়োজনে সে সেক্স ছেড়ে, সব কিছু ছেড়ে আদর্শের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা ঘটে স্নায়ুর শক্তি অন্যদিকে চালিত করার দ্বারা। এখানেই হল এই শক্তির সৌন্দর্য। কিন্তু যখন এই শক্তির সাথে আদর্শ থাকে না, রুচি থাকে না, জীবনের উদ্দেশ্য থাকে না, উদ্দেশ্যের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা থাকে না, সমাজ সেই আদর্শ বা নৈতিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে

না, যখন মানুষ দিকবিভ্রান্ত হয়ে যায়, তখন কেবলমাত্র এই স্নায়ুর শক্তির নির্গমনের পথ হয়ে পড়ে সেক্স। তাই আজকে দেখি, আমেরিকায় বা ইউরোপে মানুষ সেক্স নিয়ে মাতলামি করছে, তারা কোনও কিছুর পরোয়া করছে না, শুধু প্রেমের নামে যৌনতা নিয়ে পাগলামি করছে— তারা জানে না যে, এটা প্রাণঘাতী কাজের চেয়েও খারাপ। তারা প্রেম হারাচ্ছে, ভালবাসা হারাচ্ছে, এমন কী আনন্দও হারাচ্ছে। তাই তাদের কোনও কিছুতে তৃপ্তি হয় না। কারণ তারা উত্তেজনায় চলে। মানুষ আদর্শ হারিয়ে সমস্ত শক্তি যদি শুধু সেক্সে প্রকাশ করার চেষ্টা করে, তাহলে সে সেক্সের আনন্দকেও হারাবে— যা হচ্ছে আমেরিকায়। প্রজনন প্রক্রিয়ার উপরে তার প্রভাব পড়ছে। আমেরিকায় এফ বি আই, যেটা ওদের দেশে ধুরন্ধর গোয়েন্দা বিভাগ, তার ডিরেক্টর জে. এডগার হুবার, কমবয়সীদের মধ্যে অপরাধ করার প্রবণতা নিয়ে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। মানে উনিশের নিচে যাদের বয়স, যাদের বুদ্ধিবৃত্তি এখনও কৈশোরের স্তরে— মানসিক দিক থেকে কৈশোরের স্তর পার করতে পারলে আমরা যৌবন বলি, তার আগে পর্যন্ত যৌবন বলা যায় না— এই কিশোর-কিশোরীরা স্নেহ করতে পারে, আদর করতে পারে, কিন্তু তারা প্রেমের বোঝে কী? ফলে তারা করছে কী? তিনি বলছেন, তারা যৌবন নিয়ে মাতলামি করছে। তেরো বছরেই সেক্সের আবেগ দেখা দিচ্ছে। এ সম্বন্ধে একজনের চেতনা এবং বোধশক্তি কেউ যদি জাগিয়ে দেয়, তাহলে তা বারো-তেরো বছরেই জেগে উঠতে পারে। এ জিনিস গ্রীষ্মপ্রধান (tropical) দেশেও হয়, কিন্তু তার দ্বারা তখন কি যৌন মানসিকতা পরিণত হয়? প্রকৃত যৌবন যাকে বলি, সে কি আসে? এখন বিকৃতি বাড়ছে, স্বাভাবিক জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, জেনেটিক্সের উপরে, শরীরের উপরে প্রভাব পড়ছে, যৌন অঙ্গের উপরে পর্যন্ত প্রভাব পড়ছে। তারা স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে, তারা পরস্পর কামড়া-কামড়ি করছে— সে তো বিকৃত রুচি। তাদের আবেগ আসে, কিন্তু তারা স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় সক্ষম নয়। তাই স্বাভাবিক মানুষের মতো তারা যৌন সম্পর্ক ভোগ করতে পারে না। তারা বিকৃত রুচিকর আচরণ করে, কিছুতেই তাদের তৃপ্তি হয় না। রুচির দিক থেকে তারা সেইরকম বিকৃত কামলালসাপূর্ণ ব্যক্তি। তারা শারীরিকভাবে বিকৃত রুচিকর আচরণ করতে পারে।

আবার, যাদের শারীরিকভাবে বিকৃত রুচিকর ব্যক্তির মতো নানা আচরণ করতে আটকায়, তারা মানসিকভাবে বিকৃত রুচির ব্যক্তির মতো কারও না কারও পিছনে শুধু ঘোরে। কিছুতেই তাদের তৃপ্তি হয় না, একজনের হাত ধরে বসে আছে তো আছেই। কাজ নেই, কর্ম নেই, বসে আছে তো আছেই। মাথায় হাত

বুলিয়ে দিচ্ছে, আর বসে আছে। অন্য কোনও কিছু করবার ক্ষমতা নেই। সেটাও একটা পঙ্গু মন। চব্বিশ ঘন্টা ধরে এ ও'র হাত ধরে বসে আছে, শুধু কোলে নিয়ে বসে আছে। বিকৃত তাদের রুচি, স্বাভাবিক যৌনক্ষমতা তারা হারিয়ে বসে আছে। অত্যধিক যৌনক্রিয়া তাদের দুর্বল করে দিয়েছে। আমেরিকান সমাজে প্রজনন ক্রিয়ার উপরে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জে. এডগার হুবার সতর্ক করে দিয়েছেন যে, একসময় আমরা দেখব যে, গোটা মার্কিন সভ্যতার একটা অংশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, তাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতার অবনমন ঘটছে। ফলে আমরা দেখছি, কমবয়সিদের মধ্যে অপরাধ করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। তারা সব ড্যাং ড্যাং করছে। বলা হচ্ছে, তারা নাকি আনন্দ করছে। এটা কি আনন্দের রূপ? আনন্দ শরীর ভেঙে দিল, স্বাস্থ্য ভেঙে দিল, আমেরিকান সমাজের কাঠামো ভেঙে দিল। এর নাম কি আনন্দ? না, এর নাম আত্মবিলুপ্তি! শুধু নিজেদের সর্বনাশ করা। মেয়েরা ছটফট করে, বেশি বয়সে তাদের বিয়ে করবে কে? কোথায় তারা আনন্দ পাবে? কিছুতেই তাদের আনন্দ হয় না। আর আনন্দ পায় না বলে তারা নেশা করছে, না হয় সুইসাইড করছে, আর না হয় তারা মদ খেয়ে, নাচ-গান করে নিজেদের উত্তেজিত করে রাত কাটাবার চেষ্টা করছে। এর নাম কি আনন্দ, এর নাম কি সুখ? একটা সুখী লোকের ভণ্ডামি বা ছলনার দরকার হয় কেন? যদি কিছু হয়নি, তাহলে ছলনার দরকার হয় কেন? খামকা মদ খেয়ে নাচানাচি করার দরকার হয় কেন? নিজেকে উত্তেজিত করার দরকার হয় কেন? কোনও ভাবে ছুতো পেলেই অসুস্থতার ভান করে অন্ধকার ঘরের কোণায় পরস্পরের হাতে হাত ধরে বসে থাকা কেন? যদি কেউ স্বাভাবিক মানুষ হয়, তাহলে সে ভালবাসে, আনন্দ করে, কাজ করে, কর্তব্য সম্পন্ন করে, দায়িত্ব সম্পন্ন করে। এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের লক্ষণ। আর অন্যরা নিজেদের সর্বনাশ করছে। কাজেই, এই জিনিসটি ভাল করে বুঝতে হবে। কোনও ব্যক্তির যখন আদর্শ থাকে না, নীতি থাকে না, তখন সে জীবনে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আজকের সমাজে, আমেরিকার সমাজে বা ইউরোপে আমরা এইসব জিনিস দেখতে পাই।

ভালবাসার সঠিক চরিত্র যদি বুঝতে না পারি, তাহলে আমরা বিপ্লবী হব কী করে? আপনারা এখানে যারা এসেছেন, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, যারা বিপ্লবের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত, যারা মাথা উঁচু করে উন্নত স্বাস্থ্য, উন্নত মেধা এবং উন্নত ধীশক্তি নিয়ে যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। এর জন্য যে ধরনের নিষ্ঠার প্রয়োজন এবং যে ধরনের বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতা থাকা দরকার, সেটা নিয়েই আপনারা সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। আপনারা

কখনও বিপ্লবের স্বার্থের চেয়ে ভালবাসা এবং যৌনতাকে ঊর্ধ্বে স্থান দেবেন না। আমার দু'টি কথা আপনারা মনে রাখবেন। আপনারা যাকে জীবনে গ্রহণ করছেন, সে বিপ্লবের পরিপূরক বলেই গ্রহণ করছেন। আপনারা নিজের জীবনে জড়িয়ে রাখার জন্য কাউকে গ্রহণ করছেন না। কালই যদি দেখেন যে, জীবনে যাকে গ্রহণ করেছেন সে বিপ্লবের ক্ষতি করছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ত্যাগ করবেন এবং কোনও সম্পর্ক তার সাথে রাখবেন না, এ মনোভাব আপনাদের প্রয়োজন। কেন না আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনার জীবনের প্রয়োজনের এটা পরিপূরক তো নয়ই, এমনকী অনুকূলও নয়। তখন তাকে ত্যাগ করেই আপনি জীবনে সুখী হতে পারবেন। মানুষ হিসাবে মানুষের সমাজে সেই জিনিসই তো আপনি চাইবেন, যেটা মানুষের সমাজের প্রয়োজনে লাগে। নাহলে বিপ্লবী হিসাবে আপনার সে জিনিস চাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। সেক্স সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিকভাবে যদি বুঝতে না পারেন, ভালবাসার নীতি যদি সঠিকভাবে না বুঝতে পারেন, অথচ বিপ্লবী হতে চান, তাহলে আপনার বিপ্লবী হওয়ার সংগ্রামটি সঠিক হবে না। যে বিপ্লবী হতে চায় না, তার তো এগুলো শোনার দরকার নেই। কিন্তু এখানে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান হতে চান, তাঁরা সমাজের দায়িত্ব নেবেন, বিপ্লবের দায়িত্ব পালন করবেন। যদি এ দায়িত্বে উন্নত চিন্তা, উন্নত স্বাস্থ্য, উন্নত মেধা, উন্নত চরিত্র ও ধীশক্তি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চান, সমস্যার মোকাবিলা করতে চান, যদি আপনারা সকলে বিপ্লবের প্রতি সমর্পিত হন, তাহলে আপনারা তখনই তা পারবেন, যখন যৌনতা ও ভালবাসাকে আপনারা বিপ্লবের উপরে স্থান দেবেন না। আমার এই কথা আপনারা মনে রাখবেন, যেকোনও ভালবাসাকে বিপ্লবের সাথে মিলিয়ে জুলিয়ে রাখবেন না।

পরিষ্কার বুঝে নেবেন, যাকে নিচ্ছেন, তাকে বিপ্লবের পরিপূরক হিসাবে নিচ্ছেন। যদি বিপ্লবের খানিকটা ক্ষতি হয় বুঝতে পারেন, ধরতে পারেন, নিজে বুঝতে পারেন, বা দল থেকে কেউ বুঝিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তা পরিত্যাগ করবেন। এটা আপনার কাছে বড় জিনিস নয়। এ জিনিস আপনি চান না, এ জিনিস বিপ্লবী চাইতেই পারে না। এইটা করার জন্য আপনার তেমন উপযুক্ত শক্তি চাই। কারণ, এটা সুন্দর নয়, এটা আপনাকে সাহায্য করছে না। এটা ভালবাসার এবং যৌনতার প্রয়োজনের যথার্থ স্বীকৃতি নয়। মানুষের সমাজে সত্যিকারের মানুষ, মর্যাদাপূর্ণ মানুষ তেমন জিনিসই চায়, যা মানুষের প্রয়োজনে লাগে। উৎপাদনের স্বার্থে, ব্যক্তির বিকাশের স্বার্থে, সমাজ অগ্রগতির যথার্থ যে ধারা তার প্রয়োজন থেকে, সেই বিশেষ চাহিদা থেকে এটা জন্ম নিচ্ছে কি না,

এটাই তার বিচারের মাপকাঠি। তার চাওয়া-পাওয়া, নিছক ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার ভিত্তিতে আসছে কি না, এটা দেখতে হবে। সেভাবে আসতে চাইলে সে তাকে আমল দিচ্ছে না, সেটাকে উৎসাহিত করছে না, তার প্রকৃতিকে ধরে তার বিরুদ্ধে সে লড়াই করছে। এ লড়াই তার ভিতরে এবং বাইরে। কিন্তু সে যদি পার্টির বা বিপ্লবের পরিপূরক হয়ে আসতে চায়, তাহলে তাকে দু'হাত তুলে আহ্বান করছে। কিন্তু আহ্বান করার সময়ে কখনও এমন কাণ্ড করছে না যে, এটার সাথে মিলিয়েই তার বিপ্লব। একে জবরদস্তি বিপ্লবের সাথে মেলাবেন না। আজ এ মিলছে, তাই বিপ্লব আছে, কাল যদি না মেলে, তাহলে বিপ্লব নেই— এভাবে যদি একজন বিপ্লবী ভাবে, তবে সে যথার্থ ভালবাসার সন্ধান পাবে না। তাই আমরা একটা কথা বলি। এ কথাটা মেয়েদের কাছেও বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যারা ভালবাসা খুঁজে বেড়ায়, ভালবাসা পাওয়ার জন্য কাঁদে, তাদের স্মরণ করতে বলি, একমাত্র একজন সত্যিকারের বিপ্লবী সত্যিকারের ভালবাসা দিতে পারে, আর বাকিরা শত সততা সত্ত্বেও সত্যিকারের ভালবাসা দিতে পারে না। কারণ, তারা ভালবাসার সেই সৌন্দর্য ও উচ্চতর মানটাকে আয়ত্ত করতে পারেনি। জনসাধারণের স্বার্থ, বিপ্লব এবং বিপ্লবী দলের সংগ্রামের প্রতি যদি নিষ্ঠার অভাব থাকে এবং জনতার সংগ্রামের মধ্যে থেকে যদি একজন মানুষ তেমন রুচিগত মান আয়ত্ত করতে না পারে, তাহলে অপরের প্রতি কী করে সে উচ্চ মানবিক গুণ দেখাতে পারে? তাহলে একমাত্র বড় বিপ্লবী হলেই সত্যিকারের ভালবাসা দিতে শেখে। কমিউনিস্ট ছেলেমেয়েরা যথার্থ ভালবাসা গড়ে তুলতে পারে— যদি তারা বোঝে ভালবাসা কী, সেক্স তাদের জীবনে কেন দরকার, কতটুকু দরকার এবং কী ভাবে তা গ্রহণীয়।

মনে রাখতে হবে, এই সামগ্রিক বিপ্লবী আন্দোলনে রুচির যে মান সামগ্রিকভাবে দলের নেতৃত্ব ও অগ্রগামী সর্বোচ্চ উন্নত চরিত্রের কার্যকর্তা ও নেতাদের মধ্যে প্রকাশিত, তার চেয়ে উন্নত রুচির মানের প্রকাশ তো অন্য কোথাও হতে পারে না। এখানে যদি ঘাটতি থেকে থাকে, তাহলে সেটা ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা। একটা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্য দিয়ে রুচির যে মান প্রকাশিত হয়েছে, সে সমাজে তার চেয়ে বড় রুচির মান আর কোথাও থাকতে পারে না।

যৌথ বিচারে সত্য নির্ধারিত করার চেয়ে নির্ভরশীল জায়গা আর অন্য কোথায় আছে? এই হল পার্টির বিচার। এই হল বিপ্লবীদের বিচারের মাপকাঠি। আর পার্টির এই উচ্চ রুচিগত মানের মাপকাঠিতে যে জিনিস আপনার জীবনে এল, তা যথাযথ কি না, তা তত্ত্বের রূপে যুক্তি না সাজিয়ে অর্থাৎ র‍্যাশনালাইজ

না করে, বিচার করতে হবে, সেই জিনিস আদর্শগত আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনকে সাহায্য করে কি না, সাহায্য করতে পারে কি না। নাহলে আপনি শুধু এর সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে পারেন। কী ভাবে যুক্তি দাঁড় করাতে পারেন? না, আপনার বিপ্লবী জীবন সুন্দর হয়ে আসছে, কেননা আপনি জীবনে আনন্দ পাচ্ছেন। আনন্দ তো আপনি এমনভাবেও পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে নিরানন্দের অন্ধকারে পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে— যে আনন্দ আপনাকে ক্রমান্বয়ে টেনে টেনে একটা স্তর থেকে উপরের আর একটা স্তরের দিকে তুলবে না, যা সাময়িক ভাবে আপনাকে বিভ্রান্ত করছে, যেটাকে আমরা সাময়িক লাভ বলি, সাময়িক আনন্দ বলি। অর্থাৎ যেটা যৌন উত্তেজনা (sex impulse) , যা নিছক শরীরগত আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। আগেই বলেছি, যৌনক্রিয়া ও তার প্রভাব জন্তু-জানোয়ার ও মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা। কারণ মানুষের শরীরগত আনন্দটা মননির্ভর (psychological), এখানে তার একটা মনোগত দিক থাকে। সে মনে করে, তার এটা মনেরই আনন্দ। কিন্তু এটাকে রঙচঙ মাখিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করলে নিজেকেই ঠকতে হবে। এই বিশেষ অবস্থায় শুধু মনের আনন্দের মাপকাঠি দিয়ে নয়, বিপ্লবের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের বিচার করে নিতে হবে, বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক অর্থে সেক্সের মুক্তি আন্দোলন যেভাবে মিশে আছে, ঠিক সেই অর্থে সেক্সকে প্রভাবিত করার দিক থেকে সে এই কাজ করতে পারে কি না। সে দিক থেকেও বিষয়টাকে বিচার করে দেখতে হবে। শুধু দু'জনের মধ্যে আলোচনা করলে নিজেদের সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো (rationalise) হয়ে যাবে। নিজেদের সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করালে কী হবে? কারণ এই বিচারে ফাঁকি থাকে। এইজন্য ফাঁকি থাকে, কারণ এখানে ব্যক্তি একা একা বিচার করে, আর দল যখন বিচার করে তখন যৌথভাবে তত্ত্বগত নানা দিক থেকে বিচার করে। দল সামগ্রিক পদ্ধতিতে বিচার করার ফলে সেখানে ধরা পড়ে যায়, কেউ নিজের সপক্ষে যুক্তি করছে কি না। এটা নিছক কারওর নিজের কাজ হাসিল করা বা নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার, বা নিজের সপক্ষে যুক্তি করার তত্ত্ব নয়। এটা একটা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব। নাহলে আমরা আমাদের নিজস্ব ধারণার সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোর রাস্তায় চলে যেতে পারি, তত্ত্ব দিয়ে সততার সাথে আত্মপ্রতারণা করে ফেলতে পারি। সেক্স এলেই যেমন অন্যায় নেই, সেক্স সম্পর্কে আমাদের যেমন উদার দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে, আবার এর পাশাপাশি আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ রাখব, সাধারণ আন্দোলন ও দলের তত্ত্বগত এবং উচ্চতর আন্দোলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে সেক্স এসেছে কি না। নীতিবিগর্হিত ভাবে কোনও আন্দোলন হতে পারে না। দেখতে হবে, আন্দোলনটা

নীতিসম্মতভাবে এসেছে কি না? নীতিটা কোথা থেকে পাচ্ছি? নীতিটা পাচ্ছি জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে সেক্সের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নিয়মকে অনুধাবন করে (by studying the law of the real necessity of sex in the given condition in life)।

মনে রাখতে হবে, সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম নারীদের পিতৃপ্রধান সমাজের পীড়ন থেকে মুক্তির সংগ্রাম, ব্যক্তি হিসাবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন থেকে মুক্তির সংগ্রাম। শ্রেণিহীন সমাজে যাওয়ার সংগ্রামটির পূর্বশর্ত হিসাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামটিকে যেমন সম্পূর্ণ করার কথা, তেমনি সেটা যৌনদাসত্বের থেকেও সম্পূর্ণরূপে মুক্তির সংগ্রাম। মানুষের এই মুক্তি আজও অর্জিত হয়নি। ব্যক্তি সম্পত্তির সম্পর্কের উপরে ভিত্তি করে যে মানসিকতা, সাংস্কৃতিক মান ও রুচি তা আজও সেক্সকে প্রভাবিত করে চলেছে বলেই আমরা সেক্সের স্বাধীনতা পেতে পারি না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যৌন স্বাধীনতা, সেক্স সম্বন্ধে প্রচলিত রীতিনীতি বর্জিত হওয়ার মধ্যে নেই। ব্যক্তিগত জীবনে সঠিক বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি মেনে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সেক্সের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতার সংগ্রামটাকে ঠিক ঠিক মেলাতে পারলে তবেই আমরা সমাজে বিপ্লবের ধারাকে অপ্রতিহত রাখতে পারব, তার সাথে সাথে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সেক্সের নীতিকে পরিচালনা করতে চাই, তারও ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারব এবং অন্যদিকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করার সাথে সাথে রুচিগত দিক থেকে সেক্সের দৃষ্টিভঙ্গিটাকেও পথ দেখাতে পারব। এই দুটোর মধ্য দিয়ে এবং বিপ্লবে ধারাবাহিক অগ্রগতির মধ্য দিয়েই আমরা যৌন স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব— এক ধাক্কায় নয়,আইন পাশ করে বা প্রবর্তন করে নয়। স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে পারে না, যেমন অর্থনৈতিক মুক্তি কেউ কাউকে হাতে তুলে দিতে পারে না। এ জিনিস অর্জন করতে হয়। যেমন নারীর স্বাধীনতা কেউ নারীদের হাতে তুলে দিতে পারে না, সর্বহারা বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে যুক্ত থেকে নারীদেরই তা অর্জন করতে হবে। নারী স্বাধীনতার জন্য, নারীর উচ্চ মর্যাদাবোধের জন্য যারা লড়ছে, যারা সমমর্যাদার ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে প্রেমকে, ভালবাসাকে, পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্ককে পিতৃপ্রধান সমাজের ব্যক্তি সম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত করতে চাইছে, তার ভিত্তিতে নারীর মর্যাদার জন্য লড়ছে, সেই মেয়েদের বুঝতেই হবে, কমিউনিজমের জন্য সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, শ্রমিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম— এইসব সংগ্রামের সাথে তাদের মুক্তি সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তারা যদি এই বিপ্লবী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার থেকে পিছিয়ে যায় বা পালিয়ে যায়, তাহলে তাদের মুক্তি আসবে না।

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, ছেলেদের মধ্যে একদল ভালবাসার ক্ষেত্রে এক ধরনের মুখোশ নিতে চায়, তারা হেটায়ারিজম (hetaerism) চর্চা করতে চায়। কিন্তু মেয়েরা এ সমাজে সাধারণত স্থিতিশীল হতে চায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে হেটায়ারিজম চর্চা করার প্রবণতা কম। মেয়েরা এইদিক থেকে তুলনামূলকভাবে ভাল চরিত্রের অধিকারী। মেয়েদের চরিত্রের এই দিকটা ছেলেদের চেয়ে অনেক ভাল এবং সেই কারণেই সুন্দর। তারা অত্যন্ত সুন্দর মন ও সহনশীলতার অধিকারী হয়। সব মেয়েই হয়, সেটা নয়, কিন্তু অধিকাংশ মেয়ের ক্ষেত্রেই চরিত্রের এই গুণ আমরা দেখতে পাই। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে গতানুগতিকতা, অর্থাৎ সৃজনশীল মনোভাবের অভাবও আমরা দেখতে পাই। অন্যদিকে ছেলেদের মধ্যে ভাঙবার প্রবণতা বেশি। আবার কোনও কোনও মেয়েদের ক্ষেত্রে এই মানসিকতার অভাবের জন্যই অনেক দোষ বর্তে যায়। যখন যথার্থ প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তারা তা ভাঙতে পারে না। এইটা মেয়েদের বোঝা দরকার। মেয়েদের বুঝতে হবে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে একান্তভাবে আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়েই তাদের মুক্তি— সমস্ত দিক থেকে মুক্তি। দুটো খুব উদার মনসম্পন্ন ছেলেমেয়ের মধ্যে ভালবাসা হলেই কি তারা পুরোপুরি মুক্তি অর্জন করতে পারে? না, পারে না। মনে রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হচ্ছে, মেয়েরা বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে মুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ এই মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। একথা ছেলেদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। একমাত্র সেটা তখনই সম্ভব, যখন পারিবারিক কাজে ছেলেমেয়েদের কাউকেই বিশেষ সময় দিতে হয় না। একথা সকলেরই জানা যে, মেয়েদের সন্তান ধারণ করতে হয়, পরিবার রক্ষা করতে ঘরকন্নার অনেক দায়িত্বই মেয়েদের পালন করতে হয়। ছেলেমেয়েরা ঘরকন্নার কাজ ভাগাভাগিভাবে করার জন্য লড়ালড়ি করতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা কোনও মীমাংসায় তারা পৌঁছাতে পারে না। আসলে এ পরিস্থিতিতে কাউকে না কাউকে বাঁধা পড়তে হবে। সমাজতন্ত্রে যখন কমিউন লাইফে ব্যক্তিগত ঘরকন্নার কাজ সম্মিলিত ভাবে হবে, তখনই এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে। অর্থাৎ, শ্রম সমাজে যতক্ষণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হচ্ছে, ততক্ষণ এটা সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম, উৎপাদনের বিকাশের ধারায় যদি তারা আত্মনিয়োগ করতে না পারে, তাহলে তাদের মুক্তি মিলবে না। তাছাড়া যৌনবিকৃতির হাত থেকে, তার প্রভাব থেকে বা বিকৃত রুচি থেকেও তাদের মুক্তি মিলবে না। সমাজকে মুক্ত করতে না

পারলে সমাজের মধ্যে প্রচলিত ভাবনা-ধারণার দুর্বলতার আড়ালে আমাদের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি ঢুকতে থাকে। তাই সামগ্রিকভাবে মানুষ যতদিন মুক্তি অর্জন না করছে, ততদিন এই বিপদ থেকেই যায়। যদি সে মুক্তি অর্জনের সংগ্রামকে শিথিল করে দেয়, তবে সে বিপদের শিকার হতে বাধ্য। তাই তাকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, নাহলে সে আবার নিচে নেমে যেতে পারে। আমি পুনরায় বলছি, সেক্সকে আমরা ঘৃণা করি না, আবার সেক্সকে নিয়ে মাতামাতিও করি না এবং ভালবাসাকে আমরা একটা উচ্চাঙ্গের বিলাসিতায় পর্যবসিত করার বিরোধী। ভালবাসাই জীবনের সব নয়। ভালবাসা জীবনের অংশমাত্র। ভালবাসারও প্রকৃতি, চরিত্র নির্ধারণ করা দরকার। এগুলি সবই বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার্য বিষয়। আমাদের সমস্ত কিছুই বিপ্লবের অগ্রগতির স্বার্থে, পার্টির প্রয়োজনের স্বার্থে পরিচালিত করতে হবে।

এখন আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে উন্নত রুচিগত মান দলের ভাল কর্মী এবং নেতাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, সেটা অন্যান্যদের জীবনে ঘটতে পারে না। একটা দেশের প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্য দিয়ে রুচির যে মানটা প্রতিফলিত হয়, সমাজে তার চেয়ে বড় রুচির সন্ধান কোথা থেকে পাওয়া যাবে? এটাই হচ্ছে বিচারের যথার্থ মাপকাঠি। সেক্সের দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রাম বর্তমান সমাজের মুক্তির সংগ্রামের পরিপূরক হিসাবে কাজ করছে কি না, সেটাও দেখতে হবে। আর সেটা না হলে আমরা কোনও একটা তত্ত্ব খাড়া করে নিজেকে ঠকাব এবং পার্টিকেও ঠকাব। তাহলে দেখতে পেলাম যে, সেক্সে অন্যায় যেমন নেই, অর্থাৎ সেক্স এলেই সেটা অন্যায় হল, ব্যাপারটা তেমন নয়। সেক্স সম্বন্ধে উদার দৃষ্টিভঙ্গি যেমন থাকবে, তেমনই একই সাথে লক্ষ রাখতে হবে যে, দলের তত্ত্বগত আন্দোলন, আদর্শগত আন্দোলনের সাথে সেটা সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে কি না। এই নীতি সম্পর্কে ধারণাটা আমরা পাচ্ছি সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাসকে ভাল করে উপলব্ধি করে জীবনের যথার্থ প্রয়োজনবোধ থেকে। সমাজ বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে কী ভাবে মুক্তি সংগ্রামের সাথে যথার্থ প্রয়োজনবোধকে ভিত্তি করে নিজেকে যুক্ত করতে পারি এবং সেভাবে সেক্সকেও প্যাটার্ন করতে পারি, সেটা বুঝতে হবে। নারীদের বুঝতে হবে যে, সমাজের শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি সংগ্রামের সাথে তাদের পুরুষশাসিত দমনের হাত থেকে মুক্ত করার সংগ্রামকে যুক্ত করতে হবে, তাকে ব্যক্তির সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দমনের হাত থেকে মুক্তি সংগ্রামের সাথে যুক্ত করতে হবে, পিতৃতান্ত্রিক শোষণের হাত থেকে, ধর্মীয় নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি সংগ্রামের সাথে যুক্ত করতে হবে। এটা স্বাধীনতা সংগ্রাম

পরিপূর্ণ সফল করারও একটা সংগ্রাম, তাছাড়া যৌন দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ারও সংগ্রাম। মনে রাখতে হবে, মানুষের মধ্যে মুক্তি অর্জনের যে সংগ্রাম, সেখানে বাধা সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের মানসিক জটিলতা থেকে উদ্ভূত প্রবণতা। এর ফলে তার সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মান এমন নিচু স্তরে তাকে টেনে আনে, যার ফলে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার সংগ্রাম বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যৌনদাসত্বের হাত থেকে মুক্তি অর্জন করতে হলে আমাদের রুচিগত মান এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে আমরা সেই যথার্থ উন্নত মান অর্জন করতে পারি এবং ব্যক্তি সম্পত্তিকে ভিত্তি করে যে মানসিকতা গড়ে ওঠে তার হাত থেকেও মুক্তি অর্জন করতে পারি। এই দুটো সংগ্রামকে প্রতিটি কমিউনিস্টের ব্যক্তিগত জীবনেও মেলাতে হবে। বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে, তার এই সংস্কৃতিগত মান অর্জনের সংগ্রামের লক্ষ্যকে যুক্ত করে সেই আন্দোলনকে পরিচালিত করতে হবে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিক অগ্রগতির মধ্য দিয়েই আমরা একদিন যৌনদাসত্বের হাত থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারি। সেটা এক ধাক্কায় হবে না, সেটা আইন করেও হবে না।

আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ থেকে যদি শুরু করি, তাহলে দেখব যে, সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সেক্সের চরিত্রও পাল্টাচ্ছে। শ্রেণিসংগ্রামের সাথে সাথে উৎপাদনের বিকাশের সংগ্রামও একইভাবে চলেছে। যেমন উৎপাদনের বিকাশের ধারায় আমরা দেখছি যে, আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ভেঙে গেল এবং ক্রমে ক্রমে চাষবাস, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হল, দাসপ্রভু ও দাসপ্রথার আবির্ভাব হল। তারপর সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, পুঁজিবাদ ও তারও পরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামো ভাঙবার মধ্য দিয়ে। একই ভাবে যৌন সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই প্রসঙ্গে মর্গানের রিসার্চের ভিত্তিতে এঙ্গেলস কী বলেছেন, সেটা আপনাদের স্মরণ করাতে চাই। তিনি এ পর্যন্ত মানব সমাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন, 'স্যাভেজারি' পিরিয়ডে এক গোষ্ঠীর পুরুষদের সাথে এক গোষ্ঠীর নারীদের অবাধ যৌন সম্পর্ক ছিল, যাকে তিনি 'গ্রুপ ম্যারেজ' আখ্যা দিয়েছেন এবং এটাও বলেছেন, এটা নারীর ক্ষেত্রে 'পলিয়ান্ড্রি' ও পুরুষের ক্ষেত্রে 'পলিগ্যামি' ছিল। এরপর 'বারবারিজমে'র পিরিয়ডে 'প্যায়ারিং ম্যারেজ' বা একজন পুরুষের বহু নারীর সাথে সম্পর্ক থাকলেও একজন নারী প্রধান স্ত্রী ছিল। তেমনি একজন নারীর বহু পুরুষের সাথে সম্পর্ক থাকলেও সেই পুরুষই তার প্রধান স্বামী ছিল। তারপর 'সিভিলাইজেশনে'র পিরিয়ডে 'মনোগ্যামি' এসেছে। তার সাথে ব্যাভিচার এবং বেশ্যাবৃত্তি এল। তিনি এটাও বলেছেন, বারবারিজমের উন্নত স্তরে প্যায়ারিং

ম্যারেজ ও মনোগ্যামির মাঝখানে পুরুষেরা কর্তৃত্ব করে দাস নারীদের নিয়ে পলিগ্যামির চর্চা করত। সম্পত্তির মালিকানা আসার পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রয়োজন দেখা দিল এবং নারীদের ক্ষেত্রে মনোগ্যামি চালু করা হল। এই মনোগ্যামি পরিবর্তিত হতে হতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এক স্বামীর সাথে এক স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হল। তারপর যখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হবে এবং দীর্ঘ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শ্রেণিহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠবে— অর্থাৎ যখন সেক্সকে কেন্দ্র করে সমস্ত রকম প্রতিযোগিতা, বিদ্বেষ এবং সর্বপ্রকার মানসিক জটিলতা থেকে মানুষ মুক্ত হবে, সেক্স দাসত্ব বৃত্তির থেকে মানুষ মুক্ত হবে, তখনই মানুষ উন্নত ধরনের সমাজে পদার্পণ করবে এবং একমাত্র তখনই যথার্থ অর্থে ভালবাসার স্বাধীনতা, অর্থাৎ ফ্রিডম অব লাভ বা ফ্রিডম অব সেক্স অর্জিত হবে। ব্যক্তি সম্পত্তি উচ্ছেদ হওয়ার সাথে সাথেই এটা ঘটবে, তা নয়। কেননা মানসিক উপরিকাঠামোতে এর রেশ অনেক দিন থেকে যাবে। ফলে এই সংগ্রাম দীর্ঘদিন চলতে থাকবে। তার আগে পর্যন্ত ওই ধরনের উন্নত পর্যায়ের সমাজ স্থাপিত হতে পারবে না। এতদিন পর্যন্ত মানব সমাজে উন্নত যত বড় মানুষ দেখা গেছে, আগামী সাম্যবাদী সমাজে তার থেকেও আরও উন্নত বড় মানুষেরা যখন আসবে, তখনই সম্পূর্ণ উন্নত রুচিভিত্তিক ভালবাসার স্বাধীনতা বা যৌনতার স্বাধীনতা মানবসমাজে আসবে।

এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য আজ এখানে শেষ করছি।

বিপ্লবী দলের নেতা-কর্মীদের কাছে প্রেম ও যৌন সম্পর্ককে দেখার মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, সে বিষয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৬৯ সালে কলকাতার এক কর্মীসভায় নানা দিক থেকে আলোচনা করেন এবং অন্য একটি সভায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করেন। দুটি আলোচনার সংশ্লিষ্ট বিষয় একত্রিত করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়। সম্পাদনার কাজটি করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের নেতৃত্বে পলিটব্যুরোর সদস্যগণ।

পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ২০১৭